দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু জীবনচর্যার মূর্ত প্রতীক শ্রীরাম

— পৃঃ ১৭

জ্যোতির্ময় শ্রীরামনবমী

— পৃঃ ৩১

৭৭ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ৩১ মার্চ, ২০২৫।। ১৭ চৈত্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ১৭ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৩১ মার্চ - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পেশাদারিত্বের কাছে নতজানু মহত্ত্বের পাগলামিতে মত্ত মমতা চার্জশিট ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

পানশালায় চাকরি মেয়েদের : বিপ্লব ঘটালেন দিদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সঠিক দিশায় সঙ্ঘ সাধনায় ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

সমাজকর্মীর অবৈধ গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বালুচিস্তান : উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

মার্কস্‌বাদের বিপরীতে ভারতের চিরন্তন ঐতিহাসিক উত্তর : মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ১১

কালচারাল মার্কসিজম্ ভারতের ঐতিহ্য ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত ◻ ড. অর্পণ দাস ◻ ১৩

বীরত্বের দিব্যরূপই তাঁর স্বরূপ, মহাবীর হনুমানে তাই আস্থা শ্রীরামচন্দ্রের ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ১৫

হিন্দু জীবনচর্যার মূর্তপ্রতীক শ্রীরাম ◻ সুব্রত ভৌমিক ◻ ১৭

অযোধ্যায় রামলালার স্বপ্নময় মন্দিরে ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ২৩

জ্যোতির্ময় শ্রীরামনবমী ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

নেহরু ও ইন্দিরার সহায়তায় ইউএসএইড হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করেছিল ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৫

শ্রীরামচরিত : 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি' ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৪৩

পুলিশ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পর এখন সেই ছাত্র নেতাদের নিশানায় সেনাবাহিনী ◻ ৪৭

'মৃত্যুকুম্ভ'র বক্তরা কি ইসলামি লক্ষ্যপূরণের পথ প্রশস্ত করলেন না? ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ খেলা : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
৭ এপ্রিল
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৭ এপ্রিল
২০২৫

রাষ্ট্রবিরোধীদের দৌরাত্ম্য

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে 'ছাওয়া' সিনেমাটি মুক্তি পায়। বিদেশি বিধর্মী আক্রমণকারী মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে সম্ভাজী মহারাজের আজীবন সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমাটির মাধ্যমে। বামপন্থী ইতিহাসবিদরা বরাবরই ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে এসেছেন। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-পরম্পরার ওপর আক্রমণকারী, ধর্মান্তরণকারী, হত্যাকারীদের তারা মহানরূপে তুলে ধরেছেন ইতিহাসের পাতায়। বিভ্রান্ত করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। আর তাদের মদত দিয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী, ভোটভিখারি রাজনৈতিক দল ও নেতানেত্রীরা।

'ছাওয়া' সিনেমার মাধ্যমে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হওয়াতেই প্রমাদ গুনেছে জেহাদিরা। শুরু করেছে বিভিন্ন স্থানে হিংসা, তাণ্ডব। আর এখানেও তাদের মদত দিচ্ছে দেশবিরোধী ভোটভিখারির দল।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই ভক্তিতরঙ্গ রুধিবে কে?

শ্রীরাম হইলেন ভারতীয় জীবনচর্যার মূর্তপ্রতীক। ভারতবাসীর শ্বাসে-প্রশ্বাসে রহিয়াছে শ্রীরাম। শ্রীরামের মাধ্যমেই ভারতবর্ষীয় জীবনবোধের বাস্তবায়ন ঘটিয়াছে। তাই শ্রীরামচন্দ্র ভারতাত্মা। সেই কারণেই বিশ্বের ইতিহাসে রাজাধিরাজ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকাল 'রামরাজত্ব' অভিধায় ভূষিত হইয়া রহিয়াছে। সুশাসন ও রামরাজত্ব সমার্থক ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শপুরুষ রূপে অভিহিত করিয়া রামায়ণকে ভারতবর্ষের সর্বকালীন ইতিহাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনাদর্শ অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শাসন ব্যবস্থা বিকশিত হইয়াছে। তাহার ফলেই ভারতবর্ষে এক শ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছিল। তাই শুধু বর্তমান ভারত ভূখণ্ডেই নহে, বৃহত্তর ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও শ্রীরামচন্দ্র সমানভাবে পূজিত ও বন্দিত। অধুনা ইসলাম অধ্যুষিত দেশেও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাম মহিমাকেই পরিবেশিত করা হইয়া থাকে। বৈদেশিক আক্রমণকরীরা এহেন আদর্শপুরুষকে ভারতীয় জনমানস হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরকে চূর্ণ করিয়া তাহার উপরিভাগে কলঙ্কচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিল। মার্কস ও মেকলেপুত্ররা শ্রীরামচরিত্রকে কাল্পনিক বলিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছে। এই আঘাত ও অপপ্রচার ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা ভারতবাসীর রাষ্ট্রবোধকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রীরামমন্দির মুক্তি আন্দোলনের লড়াই পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজ নিরন্তর করিয়াছে। কলঙ্কচিহ্ন অপসারণ করিয়া শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রবিরোধীদের নিরন্তর আক্রমণ ও অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতবাসীর অন্তঃস্থল হইতে শ্রীরামভক্তির বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরে রামলালার পুনঃস্থাপনের ঘটনায় রামভক্তির প্রাবল্য রামবিরোধীরা অনুভব করিয়া আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। কমিউনিস্টরা শ্রীরামের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার করিয়াও বাঙ্গালির মন হইতে বিন্দুমাত্রও শ্রীরামভক্তির হ্রাস ঘটাইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ বিরোধিতা করিয়াই চলিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহাদের সেই স্থানটি গ্রহণ করিয়াছে এই রাজ্যের শাসকদলটি। অবশ্য তাহারা ইহা করিতেছে মুসলমান ভোটব্যাংকের লোভে। তাহাদের নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কর্ণে রামনাম প্রবেশ করিলেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া ওঠেন। নিন্দুকেরা বলিয়া থাকেন, ভূত-প্রেতাদি রামনাম সহ্য করিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলিয়া থাকেন, তিনি ইহা করেন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকের সহায়তায় ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার লোভে।

রামভক্তির প্রাবল্যে রাজ্যের হিন্দুবিরোধী শাসকদল এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছে যে, শ্রীরামনবমী সমাগত হইলেই তাহারা প্রমাদ গনিয়া থাকেন। একইভাবে ভীত ছিলেন এই রাজ্যের কমিউনিস্টরা। তাহারা প্রচার করিতেন, শ্রীরাম বঙ্গসংস্কৃতির নহে, বহিরাগত। কিন্তু দীর্ঘ তিন দশকের শাসনেও তাহারা বাঙ্গালির মন হইতে শ্রীরামভক্তি এতটুকুও হ্রাস করিতে পারেন নাই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া থাকেন, রামনবমী বাঙ্গালিদিগের উৎসব নহে। বস্তুত, এহেন রাষ্ট্রবিরোধীরা বাঙ্গালির শুধু ভোটের খবর রাখেন, তাহাদিগের হৃদয়ের রামভক্তির খবর রাখেন না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতেই জেহাদিরা স্থানে স্থানে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলা করিয়াছে। রামভক্তদিগকে রক্তাক্ত করিয়াছে। তথাপি রামভক্তদিগের উৎসাহ বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। রামবিরোধী শাসকদলের নিকট খবর রহিয়াছে, এই বৎসর রাজ্যে একলক্ষ স্থানে পূজা এবং তিনহাজার স্থানে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইবে। কোথাও কোথাও দশদিবস যাবৎ শ্রীরামমহোৎসব পালনেরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতেই শাসকদলের হৃদ্‌কম্প সৃষ্টি হইয়াছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ যে, নবান্ন হইতে আদেশ জারি করা হইয়াছে যে, নূতন করিয়া রামনবমীর শোভাযাত্রায় অনুমতি প্রদান করা হইবে না। দুর্ভাগ্য এই রাজ্যের হিন্দুদিগের যে তাহাদিগকে তাহাদের আরাধ্য পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের পূজার জন্য প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু রামভক্তদিগের এই ভক্তিতরঙ্গ রুধিবে কে? শ্রীরামভক্তির প্রাবল্যে রাষ্ট্রবিরোধীদের সমস্ত বাধা যে ভাসিয়া যাইবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে।

সুভাষিতম্

উৎসাহো বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎপরং বলং।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্।। (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

উৎসাহই শক্তিশালী। উৎসাহের চেয়ে বড়ো কোনো শক্তি নেই। উৎসাহী পুরুষের পক্ষে এই সংসারে কিছুই দুর্লভ নয়।

পেশাদারিত্বের কাছে নতজানু মহত্ত্বের পাগলামিতে মত্ত মমতা

চার্জশিট

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তদন্ত চার্জশিটে নাম থাকা সত্ত্বেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। রাজ্যপাটে লেখা হয়েছিল কিছুদিনের জন্য তাঁকে অন্তর্ধান করতে বলা হয়। মমতা ছাড়া অভিষেক হয় না। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ভিতর দিয়ে দুর্নীতির অঙ্কের উলটো রাজনীতি ফিরে এল। মমতা বা অভিষেক নয় পেশাদারিত্বের ছলচাতুরীতেই হয়তো বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে। পেশাদারদের কাছে নতজানু হয়ে মমতা রাজ্য ভোট লড়তে চলেছেন। বিজেপির অসাধারণত্ব যে তারা দু'বছর ধরে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটারের মন জয় করে রেখেছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতিমুক্ত। তৃণমূলের মুখপাত্ররা কোনো অঙ্কের জোরে তা অগ্রাহ্য করতে পারছে না। বিজেপি বহিরাগত দল--- তাদের এই তত্ত্বও অচল হয়েছে। তৃণমূলের জোড়া ফুল মানে মমতা আর অভিষেক। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল একটি রাজ্যে মুখের রাজনীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২৭ বছর ধরে লড়াই করে বিজেপি দিল্লি দখল করেছে। কোনো মুখ ছিল না। যেমন ছিল না মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রের ভোট জেতার সময়। দল তৈরির আগে থেকেই মমতা মুখের রাজনীতি করে সাফল্য পান। পশ্চিমবঙ্গে ভোট জিততে আগামীদিনে বিজেপিকেও হয়তো সেই কৌশল নিতে হবে। সময় ব্যতিরেকে তা করতে হবে। সেটাই হবে বিজেপির 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতির প্রকৃত রূপায়ণ। মমতা যখন দল তৈরি করেন, তখন অভিষেক ১১ বছরের কিশোর। বাঙ্গালি আবেগপ্রবণ, পারিবারিক জাতি। মমতা সে আবেগকে কাজে লাগান। মেয়ে আর দিদি সেজে। নির্বাচনে সাফল্য পেতে হলে বিজেপিকে ভোটারদের সেই মিথ্যা আবেগের মোড়ক খুলে দিতে হবে। প্রয়োজন ঐক্য। মমতার দলের দুর্বলতাকে ব্যবহার না করে কেবল পারিবারিক কিসসা বলে এড়িয়ে গেলে তাতে মমতার সুবিধা। রাজ্যের মানুষের পারিবারিক মনোভাবের মধ্যে বিজেপিকেও শামিল হতে হবে।

মমতার মতো বিজেপির নেতা-নেত্রীরাও যে এ রাজ্যের পরিবারের অংশ ভোটারদের তা বোঝানোর জন্য সময় মাত্র এক বছর। মুখের রাজনীতির অগ্রভাগে রয়েছে মেগ্যালোম্যানিয়া কথাটি। গ্রিক পরিভাষায় বলে 'মেগাস' আর 'ম্যানিয়া'। বা মহত্ত্বের পাগলামি। আগে পিছু করে সাতের দশক থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব শাসক এই রাজনীতি করছে। তাতে রাজ্যের ক্ষতি হয়েছে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত কোনো শাসকই তা বুঝতে পারেনি। অর্ধশতাব্দী ধরে রাজ্যকে প্রায় পিষে ফেলেছে এই মহান পাগলদের দল! এই মহান পাগলামির একটি বৈশিষ্ট্য— দোষ স্বীকার না করে সবার চাইতে নিজেকে বড়ো বা শ্রেষ্ঠ ভাবা। এর কোনো চিকিৎসা নেই। যতক্ষণ না ভোটার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। তবে তার আগে রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চিকিৎসক নিজেই রোগে আক্রান্ত। ব্যক্তিগত স্তরে সময় বিশেষে তা প্রকাশ পায়।

তবে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তা সব সময় বিদ্যমান। জরুরি অবস্থার আসল দুষ্কৃতী সিদ্ধার্থ (মানু) রায় বিতাড়িত হন ১৯৭৭ সালে। ২০০০ সালে জ্যোতি বসুকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করে তার দল। এরপর নিজের ছায়ায় বাড়তে থাকা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক ইতি হয়। রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে স্থান হয় বিদেশি বামপন্থী আর কংগ্রেসের। বদলি আমদানি মমতা প্রতিটি স্তরে তাদের মহতি পাগলামিকে ছাপিয়ে গেছেন। তবে প্রভুহীন মমতা যে ধরনের ম্যানিয়ায় ভোগেন, প্রভুভক্ত বিদেশি বাম ও কংগ্রেস সেই ম্যানিয়ায় সরাসরি ভোগেনি। অভিষেকের বিরুদ্ধে চার্জশিট কার্যকর হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে বিচারবিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত। তা আগামীদিনে কার্যকর হতেও পারে। এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি বলে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে রাজ্যের মানুষ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত মমতার বিরুদ্ধে তাদের চার্জশিট তৈরি করবে না। তাই প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপিকে তার ফয়দা তুলতে হবে। প্রধান বিরোধী দলের মুখ তৈরি হতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার, সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে সর্বাত্মক জন-আন্দোলন সংগঠিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

> **তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল মমতা আর অভিষেককে বাদ দিয়েই চলে। ওই দু'জনের লড়াইটা আদতে সাজানো।**

একনম্বর সর্বভারতীয় দল হিসেবে একটি আঞ্চলিক, পারিবারিক দল তৃণমূলের বিরোধিতা করা বিজেপির কাছে কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল মমতা আর অভিষেককে বাদ দিয়েই চলে। ওই দু'জনের লড়াইটা আদতে সাজানো। মমতা আর অভিষেকের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের চার্জশিট কার্যকর করতে যোগ্য ও উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন আর সঙ্গে দরকার নতুন মুখ। রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলকে উৎখাত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নতুন মুখের বিষয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের ধারণাটিও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ মমতার সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মমতা-অভিষেক বিরোধী চার্জশিট ঠুঁটো হয়ে থাকবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পানশালায় চাকরি মেয়েদের
বিপ্লব ঘটালেন দিদি

নারীপ্রেমীষু দিদি,

রাজ্যে চাকরি নেই। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের একটা অংশকে ভিনরাজ্যে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে যেতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েদের কর্মসংস্থান দরকার। তাই দিদি, আপনার সরকার আইন বদলে ভালোই করেছে। ১৯০৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ আবগারি নীতি অনুযায়ী, কোনো 'অন' ক্যাটাগরি (যেখানে বসে মদ খাওয়া যায়) মদের দোকান বা পানশালায় মহিলাদের কাজের অনুমতি ছিল না। পানশালাতেও এবার থেকে কাজের সুযোগ পাবেন মহিলারা।

যুগ বদলেছে, সময় বদলেছে। লিঙ্গবিভেদ এখন সামাজিক 'অপরাধের' সমান। তাই সব কাজে নারী-পুরুষ সমানাধিকার থাকা উচিত। আমি এটা মনে করি। কিন্তু তার আগে নারীর সুরক্ষার বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে তো। এই সব সমানাধিকারের নীতি সেখানেই কাজ করে যেখানে নারীরা পুরোপুরি নিরাপদ।

সত্যি দিদি, যেখানে হাসপাতালে নিজের হাসপাতালে একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুন হতে হয় সেখানে এসব সমানাধিকারের কথা বাতুলতা। একের পর এক নারী নির্যাতন, মেয়েদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে। ২০২৪ সালটা এক ভয়ংকর বছর ছিল। আলিপুরদুয়ার থেকে মুর্শিদাবাদ, কুলতলি থেকে পটাশপুর, বারবার নির্যাতনের অভিযোগ। লালসার হাত থেকে রক্ষা পায়নি মেয়েরা। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য যা আরও বেশি করে লজ্জার।

একটা হিসাব বলছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৮৯ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, এই সব পরিসংখ্যান পুরো ঠিক হয় না। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার ভাই মানে তৃণমূল নেতাদের ভয়ে মুখ খুলতেই পারেন না নির্যাতিতারা। থানায় গেলেও কোনো কাজ হয় না। অভিযোগ নেওয়াই হয় না।

এসব দেখেই গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্যকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সরকারি ও বেসরকারি, উভয়ক্ষেত্রেই কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বলেছে আদালত। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এ বিষয়ে একটি 'টিম' গঠন করতে বলা হয়েছে। কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখবে। বিশেষত রাতে যে মহিলারা কাজ করেন, তাঁদের নিরাপত্তায় গুরুত্ব দিতে বলেছে হাইকোর্ট। নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনার পর একটি খসড়া নোটিস তৈরি করবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওই 'টিম'। সেই অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে পদক্ষেপ করতে হবে।

> **খোদ কলকাতার বুকে পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ মামলায় প্রশাসনের ভূমিকা কেমন ছিল, তা নিয়ে এখনো নাগরিক সমাজে আলোচনা হয়। নদিয়ার গাংনাপুরে এক গির্জায় 'মাদার সুপিরিয়র'-কে গণধর্ষণ, কামদুনি বা ২০২২ সালে নদিয়ায় গণধর্ষণে নাবালিকার মৃত্যুর পরে তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে ফেলা— এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হলেও তদন্ত ও বিচারের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।**

তৃণমূল আমলে শহর, গ্রাম, মফস্‌সলে নাবালিকা থেকে প্রৌঢ়া, এমনকী বৃদ্ধাদের উপরে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলির গুরুত্ব খাটো হয়ে যায় না। খোদ কলকাতার বুকে পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ মামলায় প্রশাসনের ভূমিকা কেমন ছিল, তা নিয়ে এখনো নাগরিক সমাজে আলোচনা হয়। নদিয়ার গাংনাপুরে এক গির্জায় 'মাদার সুপিরিয়র'-কে গণধর্ষণ, কামদুনি বা ২০২২ সালে নদিয়ায় গণধর্ষণে নাবালিকার মৃত্যুর পরে তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে ফেলা— এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হলেও তদন্ত ও বিচারের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সন্দেহ তৈরি হয়েছে, প্রশাসনের একাংশ কি বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে চায়?

মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয় এখানে অপ্রতুল। পুরুষদের সমস্যা না থাকলেও মহিলাদের বিপাকে পড়তে হয়। শহর কলকাতাতেই অনেক জায়গায় গিয়েও এমন সমস্যায় পড়তে হয় নারীকে। সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। শহরের শৌচালয়গুলিতে কিন্তু স্যানিটারি ন্যাপকিনের বন্দোবস্ত চোখে পড়ে না। হঠাৎই ঋতুস্রাব শুরু হলে, কীভাবে সামলাবেন মেয়েরা? একবিংশ শতকে পৌঁছেও এই ভাবনা নাড়া দেয়নি সমাজকে।

অতিথি কলম

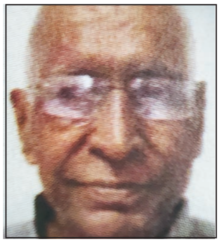

মধুভাই কুলকর্ণী

সঠিক দিশায় সঙ্ঘ সাধনায়

রাষ্ট্রের বিরাট স্বরূপকে জাগ্রত রাখা স্বাভিমানের লক্ষণ এবং রাষ্ট্র রক্ষার নিশ্চয়তা। প্রগতির পথে চলার বিশ্বাস। সঙ্ঘ কাজের ব্যবহারিক রূপ হলো নিত্য শাখা। রাষ্ট্রহিতের সামূহিক সংকল্প স্মরণের স্থান।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য কোনো নিয়ম তৈরি করেন এবং আজীবন সেই নিয়ম পালন করে থাকেন, তবে তা এক ধরনের তপস্যা। যেমন, কেউ রাম নাম জপ করার নিয়ম ঠিক করে নেয়, ১০৮ পুঁতির মালা প্রতিদিন জপ করবে। সময় নিশ্চিত করে সেই মতো অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে থাকে, তবে তা সেই ব্যক্তির তপস্যা। কোনো পরীক্ষা থাকুক বা নিজের বিয়ে বা কোনো শোকের ঘটনাতেও ব্যক্তি তার নিজের জন্য নির্ধারিত নিয়ম পালন করেন এবং এই নিয়মকে বছরের পর বছর পালন করে যাওয়ার নামই তপস্যা। এইরূপ তপস্যার কারণে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায়। জীবনে সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ চলতেই থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তির মনোবল সুদৃঢ়, তিনি সহজেই এমন সমস্ত প্রসঙ্গকেই অতিক্রম করতে পারেন।

প্রতিদিন সঙ্ঘের শাখায় যাওয়াটাও একটা নিয়ম। শাখার কার্যপদ্ধতি নির্মাণকারী ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার একবার কোনো একটা কাজে এক গ্রামে যান। কাজ শেষ করে বের হতে দেরি হয়ে যায়। নাগপুরে পরদিন তাঁর প্রভাত শাখায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নাগপুরে ফেরার কোনো বাস না থাকার কারণে ডাক্তারজী হেঁটেই রওনা দেন। অনেকটা পথ চলার পর পিছন থেকে একটা ট্রাক আসতে দেখেন। ট্রাকটি ডাক্তারজীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। চালক ডাক্তারজীর পরিচিত, তিনি ডাক্তারজীকে ট্রাকে বসিয়ে সময় মতো নাগপুরে পৌঁছে দেন। ডাক্তারজী পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে শাখায় যেতে পারেন।

ডাক্তারজীর কাকা আবাজী হেডগেওয়ারের বোন অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারজীকে কিছুদিনের জন্য ইন্দোর যেতে হয়। ইন্দোর ও দেওয়াসে তিনি শাখা শুরু করে দেন। বিহারের রাজগীরে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। ডাক্তারজী সেখানে কিছুদিনের জন্য নিজের জন্য চিকিৎসার করাতে যান। তিনি সেখানেও বিদ্যার্থীদের জন্য শাখা শুরু করেন। একবার মহারাষ্ট্রের পণ্ঢরপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন পূজনীয় ধূঢ়া মহারাজ দেগলুকর। সেখানে অনেক বক্তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীও ছিলেন। তিনি সভাপতিকে অনুরোধ জানান, 'আমি সকাল ৭ টায় শাখায় যাব। ৭.৩০ মিনিটে ফিরে আসব। এই সময়টা ছেড়ে আমার বক্তব্য রাখবেন।' পূজনীয় ধূঢ়া মহারাজ শ্রীগুরুজীর নিত্য শাখা যাওয়ার নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। নির্ধারিত সময়ে পণ্ঢরপুরের নগর কার্যবাহ গাড়ি নিয়ে মঞ্চের কাছে উপস্থিত হন। শ্রী গুরুজী শাখায় যান এবং সময় মতো ফিরে আসেন। পূর্বনির্ধারিত ৭.৩০ মিনিটে তাঁর বক্তব্য শুরু হয়।

সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক শ্রীকুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ভোপালে সমিধা কার্যালয়ে থাকতেন। সেখানে তিনি সম্পর্ক করে বালক বিদ্যার্থীদের শাখা শুরু করেন। সেসময় তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর। 'পরীক্ষা থাক বা বাড়িতে কোনো মঙ্গলানুষ্ঠান, আমার শাখায় যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আসবে না' এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলা সঙ্ঘের কর্মঠ কার্যকর্তা প্রতিটি রাজ্যেই পাওয়া যাবে।

একবার এক জেলা প্রচারক একটা ঘটনা বলেন, এক স্বয়ংসেবকের বোন হঠাৎ করেই মারা যায়। মাত্র ২৮ বছর বয়স। বাসে বসার পর হঠাৎই সিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। যখন তার মৃতদেহ বাড়িতে আনা হলো সেসময় তার মা-বাবা শোকে আকুল। পরদিন শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু সেদিন বিকালে সেই স্বয়ংসেবক যথারীতি শাখায় উপস্থিত হন। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক প্রতিদিন 'পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে' গেয়ে ভারতমাতার প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা সমবেতভাবে গাওয়া হয়। তাতে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত লাভের কথা থাকে না। রাষ্ট্রহিতে চলা সামূহিক তপস্যা হলো সঙ্ঘের শাখা। তপস্যার দ্বারা মনোবল বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিরও, সমাজেরও। পরাধীন মানসিকতা ছেড়ে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হিন্দুসমাজকে উঠে দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলতেন, 'স্বয়ংসেবকরা নিয়মিত শাখা চালাতে থাকে, তবে বিজয় সুনিশ্চিত।'

একাত্ম মানবদর্শনের প্রণেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন, সমাজের বিরাট স্বরূপ সবসময় জাগ্রত থাকা উচিত। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এবং কচ্ছ থেকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল হিন্দু সমাজের একটাই মহৎ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একই সময়ে উঠে দাঁড়ানো শ্রী রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের সময়কালকে সকলে অনুভব করি। লক্ষ লক্ষ গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা শিলাপূজন করে শিলাগুলি অযোধ্যা পাঠায়। তা সম্ভব ছিল রামভক্তির কারণে। সেই সময়ই দূরদর্শনে রামানন্দ সাগরের নির্মিত ধারাবাহিক রামায়ণ শুরু হয়। 'শ্রীরাম' এই তিন অক্ষর জনমানসে কী প্রভাব ফেলতে পারে, তার অনুভূতি সমগ্র দেশবাসীর হয়েছিল। সমাজের বিরাট স্বরূপের বাস্তবিক দর্শন হয় দুইবারের করসেবার সময়। সকল প্রান্তের, সমস্ত জাতি-বর্ণের, সমস্ত ভাষাভাষীর, সমস্ত পন্থ-সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রীরামই রয়েছেন, এমন মন্তব্যকারী কিছু মুসলমান ও খ্রিস্টান বন্ধুও করসেবায় শামিল হয়। এতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মানুষও সম্মিলিত হন।

৫০০ বছর আগেকার কলঙ্ক, অপমানকে ধুয়ে মুছে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা করসেবকদের মনের মধ্যে ছিল। মাত্র ৫ ঘণ্টাতেই পরাধীনতার

প্রতীক বাবরি ধাঁচা ধুলোয় মিশে যায়। রাজা সুহেলদেবের কালখণ্ড থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত প্রচুর যুদ্ধ হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষের বলিদান হয়েছে, কিন্তু তখন উত্তর-দক্ষিণ,পূর্ব-পশ্চিম, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ একই ইচ্ছা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এমন দেদীপ্যমান ঘটনা আমাদের দেশের ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমবারই ঘটে। রাজারাজরার কালে 'যথা রাজা তথা প্রজা' সূত্রটি শেখানো হতো। বর্তমানে 'যথা প্রজা তথা রাজা' এই সূত্রটি শেখানোর প্রয়োজন।

সেদিন দূরদূরান্ত থেকে আসা করসেবকদের সমাজের বিরাট জাগ্রত রূপের অনুভব হয়েছিল। তামিল, মালায়ালম, তেলুগু, কন্নড় ভাষা উত্তর ভারতের মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। দক্ষিণ ভারতের করসেবকরা হিন্দি বলতে পারতেন না। শুধুমাত্র প্রান্ত এবং করসেবক এই পরিচয়টুকুতেই গভীর আত্মীয়তা প্রকটিত হতো, তাতেই দক্ষিণের করসেবকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, মালিশ করার জন্য তেল দেওয়া, গরম জল, ভরপেট খাবার এবং রাতে থাকার ব্যবস্থা। না চেনা, না জানা, রামকাজের জন্য যাচ্ছে, এটুকুই নিজের পরিচয়। বিচারালয়ের যুক্তি-তর্কে ৩০ বছর সময় পেরিয়ে যায়। পুরো একটা প্রজন্মই পেরিয়ে যায়, কিন্তু মন্দির নির্মাণের জন্য নিধি সমর্পণে উৎসাহ তেমনিই দেখা যায়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে মানুষের উৎসাহ একটা অন্য স্তরে পৌঁছে যায়।

রামসেতু রক্ষা আন্দোলনেও এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অরুণাচল থেকে এর্নাকুলম পর্যন্ত নিধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে ২ ঘণ্টার জন্য পথ অবরোধ আন্দোলন করা হয়। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড জমি বিতর্কে জম্মুর সমস্ত নাগরিক এবং শিব, পার্বতী ও গণেশ বেশে বাচ্চারাও আন্দোলনে শামিল হয়। মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, গুরুগোবিন্দ সিংহ, লাচিত বরফুকন, হরিহর, বুক্ক প্রমুখ আধুনিককালের বীর পরাক্রমী মহাপুরুষদের কারণে বিরাট হিন্দু সমাজে জাগৃতির কাল শুরু হয়, কিন্তু তা পৃথক পৃথক ভৌগোলিক অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু সময় পর্যন্ত তার প্রভাব ছিল। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব- পশ্চিম সবদিকেই হিন্দু সমাজ জাগ্রত — এমন অনুভব স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে প্রথমবার দেখতে পাওয়া গেল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো প্রসঙ্গ বিশেষে জাগরিত হওয়া সমাজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে না। সমাজের বিরাট স্বরূপ সর্বদাই জাগ্রত থাকা উচিত। এর জন্য রাষ্ট্রহিতের সংকল্প নিয়ে ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপনা করেন। রাষ্ট্রের বিরাট স্বরূপকে জাগ্রত রাখা স্বাভিমানের লক্ষণ এবং রাষ্ট্র রক্ষার নিশ্চয়তা। প্রগতির পথে চলার বিশ্বাস। সঙ্ঘ কাজের ব্যবহারিক রূপ হলো নিত্য শাখা। রাষ্ট্রহিতের সামূহিক সংকল্প স্মরণের স্থান। নিত্য রামনাম জপ কোনো ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত সংকল্পের বিষয়, কিন্তু রাষ্ট্রহিতের সংকল্প সামূহিকই হতে পারে। সংকল্পের নিত্য স্মরণই তপস্যা। এই জন্য রাষ্ট্রহিতের সামূহিক সংকল্পের স্থান হলো সঙ্ঘের শাখা, সেজন্য শাখা তপস্যাস্থানের সমতুল্য। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮০,০০০ 'তপোস্থল'-এ লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক রাষ্ট্রহিতের সংকল্প নিয়ে উচ্চারণ করেন, 'পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্'।

নিত্য শাখায় গাওয়া প্রার্থনাতে 'পরম সুখ'-এর ব্যাখ্যা সূত্র রূপে দেওয়া হয়েছে। 'সমুৎকর্ষ' ও 'নিঃশ্রেয়স', উভয়েরই প্রাপ্তি অর্থাৎ পরম সুখ। সমাজের প্রত্যেক সহযোগকারীরই তা পাওয়া উচিত। সমুৎকর্ষ মানে পার্থিব সম্পদ এবং নিঃশ্রেয়স মানে জ্ঞান সম্পদ। পরম বৈভব অর্থাৎ সকলের কল্যাণকারী, সর্বসমাবেশক, একাত্ম দৃষ্টিকোণ প্রদানকারী ভাবনা। এই ভাবনা সংঘর্ষ ও রাক্ষুসে প্রবৃত্তির ভিত্তি নয় বরং বন্ধুত্বের ভাবনাই এর ভিত্তি। বন্ধুত্বের ভাবনা হলো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। এটি 'তত্ত্বম্ অসি'-র বিশ্বব্যাপী সত্যকে ব্যবহারে প্রকাশ করার আচরণ; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। এর জন্য সম্ভবত ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন, 'এই তত্ত্ব ভগবান গৌতম বুদ্ধের ধম্ম থেকে নেওয়া হয়েছে' (বস্তুবাদী বিপ্লব থেকে নয়)।

'তত্ত্বমসি'-র ভাব আমাদের ব্যবহারে পুরোপুরি এলে বন্ধুভাবের অনন্ত বিস্তার ও বিকাশ হতে পারে। নিজ পরিবার, নিজ গ্রাম, নিজ দেশ এবং তার আগে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত তার বিস্তার ঘটতে পারে। '**বসুধৈব কুটুম্বকম্**' এই সত্যেরই বিরাট স্বরূপ। 'তত্ত্বমসি'-র বিশ্বব্যাপী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান পরম্পরাকে ধর্ম বলে। তপস্যা ও সংগঠন শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে বা ভোগবাদী সংস্কৃতির চাকচিক্যে ভুলে আমরা যেন ধ্যেয় থেকে বিচলিত না হই, এর জন্য প্রার্থনার একটি পঙ্ক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির্
বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্।
পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্
সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।

অর্থাৎ, 'আমাদের বিজয়শালিনী ও সংগঠিত কার্যশক্তি মাধ্যমে এই ধর্মের (ভারতে উৎপন্ন জ্ঞানপরম্পরা) রক্ষা করে, নিজ রাষ্ট্রকে পরম বৈভবের শিখরে পৌঁছতে সমর্থ হই।

১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর মৃত্যু হয়। ১৯৩৯ সালে সিন্ধিতে ডাক্তারজীর উপস্থিতিতে সঙ্ঘের প্রমুখ অধিকারীদের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠক ১০ দিন ধরে চলে। সেই বৈঠকে সঙ্ঘের বর্তমান প্রার্থনা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয়। ১৯৪০ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত শাখা স্থানে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তপোস্থলে এই প্রার্থনা গাওয়া হয়। এত বছরের তপস্যার পরে এই সঙ্ঘ প্রার্থনা এখন মন্ত্রের সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যস্তময় দিনগুলিতেও পূজনীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের দূরদৃষ্টি দেশের সংগঠন শাস্ত্রের মন্ত্র অর্থাৎ সঙ্ঘ শাখা ও 'প্রার্থনা' রূপে রাষ্ট্রহিতের পূর্ণ দর্শন প্রকাশ করে। এই কাজ থেকে স্পষ্ট যে, তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মহাপুরুষ ছিলেন।

আসুন, আমরা আজ থেকেই বাড়ির কাছে সঙ্ঘের শাখায় যাওয়া শুরু করি এবং রাষ্ট্রহিতের উদ্দেশ্যে চলা তপস্যাতে সহভাগী হই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে আগামী ১৪, ২১ ও ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। এই তিনটি বিশেষ সংখ্যায় সঙ্ঘের তথা বিবিধ ক্ষেত্রের দেশব্যাপী কার্যকলাপ ও কার্যবৃদ্ধির সম্পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ করা হবে।

দাম একই থাকছে ১৬.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন। কমপক্ষে ১০ কপি নিলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

—ব্যবস্থা বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

সমাজকর্মীর অবৈধ গ্রেপ্তারীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বালুচিস্তান

উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিল

আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে বালুচিস্তান। ঘটনার সূত্রপাত গত ২২ মার্চ পাকিস্তানি পুলিশের হাতে বালুচিস্তানের সমাজকর্মী মেহরাং বালুচের গ্রেপ্তার। এরপরই 'বালুচ ইয়াকঝেটি কমিটি' মার্চ মাসের ২৪ তারিখ থেকে পথে নেমে বিক্ষোভের আহ্বান জানায়। এই বিক্ষোভ দমনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বালুচ নারী, শিশু, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর বর্বরতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাক-সামরিক বাহিনী বলপূর্বক বিক্ষোভকারীদের ওপর বর্বরতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোয়েটা-সহ বালুচিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ বালুচদের প্রতি ভয়াবহ নির্যাতন চালাচ্ছে পাক বাহিনী। নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে গণহত্যা চালিয়ে বিক্ষোভকারীদের মৃতদেহ বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করে পাকবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সেই মৃতদেহের সামনে বিশেষ নমাজ পাঠ জানাজা করার পরিকল্পনা ছিল।

সেই পরিকল্পনা ঠেকাতেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে পাক-নিরাপত্তা বাহিনী মেহরাং বালুচ এবং আরও অনেক বালুচ মানবাধিকার কর্মীকে সাঁজোয়া যানে করে বিক্ষোভস্থল থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ যে, বালুচিস্তানে বালুচ ন্যাশনাল মুভমেন্ট এবং বালুচ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আজাদের মতো সংগঠনের কর্মীদেরকে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে। তাদের গুম করা হচ্ছে, এমনকী তাদের টার্গেট কিলিংও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এককথায় ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এসব সংগঠনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছে বালুচিস্তানে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিক্ষোভ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা স্বাভাবিক রাখা যাবে তা নিয়ে বেজায় আশঙ্কায় ছিল পাকিস্তানের পুলিশ। শেষপর্যন্ত করাচির পুলিশ কমিশনার পাকিস্তানের করাচি শহরে জারি করেন ১৪৪ ধারা। উল্লেখ্য, ইদের আগের করাচিতে ১৪৪ ধারা জারি হতেই শহর জুড়ে পুরো থমথমে পরিস্থিতি। যার ফলস্বরূপ কোনো প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অবস্থান, প্রতিবাদ, পাঁচজনের বেশি জমায়েত করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র 'দ্য ডনে'র খবর অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এই বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়টি সুপারিশ করেন করাচির দক্ষিণ জোনের ডিআইজি সঈদ আসাদ রাজা। জানা গিয়েছে, করাচি প্রেস ক্লাব থেকে বালুচরা তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, মেহরাংকে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই, পাকিস্তানে কোয়েটাতে এক আস্ত ট্রেন অপহরণ করে বালুচ বিদ্রোহীরা। ঘটনায় বহু জনের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। এরপর পাকিস্তানি সেনা সেই ট্রেন থেকে অনেককেই উদ্ধার করে। মৃত্যুও হয় অনেকের। তারপরই আসে বালুচ নেত্রী মেহরাং-এর গ্রেপ্তারির খবর। ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন বালুচরা।

জানা গিয়েছে, বালুচ ইয়াকঝেটি কমিটি (বিওয়াইসি) গত ২৪ তারিখ স্থানীয় সময় বিকেল চারটে থেকে এই বিক্ষোভের কর্মসূচি নেয়। এর আগে, এই সংগঠনের নেত্রী মেহরাং-সহ ১৬ জন সমাজকর্মীকে আটক করে পাকিস্তান পুলিশ। কোয়েট্টার শরিব রোডে তাদের ক্যাম্প থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা সেখানে সাধারণ মানুষকে জোরপূর্বক গুম করার প্রতিবাদ করছিলেন। তখনই এদের আটক করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে, বালুচ ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ব্রিটেনের সদস্যরা সেদেশে এই ঘটনার প্রতিবাদে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে প্রতিবাদে মুখর হন। 'বালুচ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল'ও ঘটনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ডাক দেয়। 'বালুচ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল'-এর দাবি, পাক-প্রশাসনকে নিঃশর্তে মেহরাং-সহ বাকিদের মুক্তি দিতে হবে। প্রসঙ্গত, পাকিস্তান সৃষ্টির বছরখানেকের মধ্যেই বালুচিস্তান আন্দোলনের জন্ম। বালুচ-বিদ্রোহীরা দাবি করে যে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে বালুচিস্তানকে অবৈধভাবে সংযুক্ত করেছে। তখন থেকে, বালুচ-জাতিগোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং সংস্কৃতির সুরক্ষা এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবিও তারা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বালুচরা সঠিকভাবেই অভিযোগ করে যে, এই অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগের এক ও একমাত্র লক্ষ্যই হলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পঞ্জাবি-ভাষী মুসলমানদের সেবার জন্য বালুচিস্তানের সম্পদকে লুঠ করা।

যাইহোক, সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৮তম অধিবেশনেও বালুচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠে এসেছে। পাকিস্তানের বিদেশ বিভাগের সমন্বয়ক এবং বালুচ জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিয়াজ বালুচ বালুচিস্তানে ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন ও নৃশংসতার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বালুচ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ওপর নিপীড়নের কথা উল্লেখ করে নিয়াজ বালুচ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বালুচ সংগঠনের কর্মীদের নির্বিচারে আটক, তাদের হয়রানি এবং তাদের কণ্ঠস্বর দমন করার অভিযোগও এনেছেন। নিয়াজ বালুচ অভিযোগ করেছেন যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বালুচিস্তান-সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তিনি বলেছিলেন যে, এই ঘটনাগুলি পাকিস্তান সরকার সমর্থিত গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যার কারণে বালুচ পরিবারগুলি সম্মিলিত শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে। নিয়াজ বালুচ মনে করিয়ে দেন যে, মানবাধিকার কর্মী সাঈদা বালুচ ও তার বোনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও বালুচিস্তানের কাম্বারানি পরিবারের এক ডজনেরও বেশি সদস্যের জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়া এবং বালুচিস্তান সংকটের গভীরতার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। □

মার্কস্‌বাদের বিপরীতে ভারতের চিরন্তন ঐতিহাসিক উত্তর

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম

পিন্টু সান্যাল

অখণ্ড বঙ্গের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণ তথা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গে যে দুজন মহাপুরুষের কথা মনে আসে তাঁরা হলেন— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইসলামি শাসনকাল হোক বা ব্রিটিশ, বিধর্মীদের অত্যাচার ও অনাচার থেকে বাঁচাতে হিন্দু সমাজেকে এই দুজন ধর্মরক্ষাকর্তা পথ দেখিয়েছেন। এঁদের পরিবারে শ্রীরঘুবীরের পূজা ও উপাসনার চল ছিল। তাই বঙ্গভূমিতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির এক ধারাবাহিক ইতিহাস আছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতায় থাকা দলটির বিদেশি সমর্থক দলটি শ্রীরামকে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালির মধ্যে বিভাজনের রেখা হিসেবে দেখাতে চায়। মার্কস্‌বাদ ও মার্সস্‌বাদীরা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বদলে প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয় আর সে কারণেই শ্রীরামের ঐতিহাসিকতা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে।

শ্রীরাম ভারতীয় ধর্মবোধের বাস্তবিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রামকথা শুনিয়েই বিদ্যার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাদান শুরু করেছিলেন। বিশ্বকবির কথায়--- ‘‘রামায়ণ সেই অখণ্ড-অমৃত পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাতৃত্ব, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে’’ (রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য)।

রামকে যদি কাল্পনিক বলা হয় তাহলে শুধু ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে আঘাত করা নয়; সত্য রক্ষার্থে মানুষের ত্যাগের সীমা, অশুভকে পরাস্ত করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক জাগরণের উচ্চতম নিদর্শনের বাস্তবিকতাকে অস্বীকার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতাত্ত্বিকরা যে আদর্শ সমাজের ও সুরাজের কথা কল্পনা করেছিলেন, রামরাজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষে তারই বাস্তবায়ন হয়েছে। রামরাজ্য বাস্তবিক হলে সাম্যবাদের অসার তত্ত্ব গেলানো কঠিন হয়ে যায়।

রামকথা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজের প্রত্যেক অংশে গার্হস্থ্য জীবনের যে মূল্যবোধ শিখিয়েছে, যার ফলে ভারতীয় সমাজ সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতার অভ্যাস করাকে রামভক্তির সমার্থক মনে করেছে; সেই অভ্যাস থেকে সমাজকে সরিয়ে দিতে ইউরোপীয় বস্তুবাদী চিন্তা ও অভ্যাস দিয়ে ভারতীয় মনোভূমিতে আঘাত করার প্রয়াস হয়েছে।

সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মর্যাদার সীমাকে চিহ্নিত করে যাঁর জীবনচর্যা, তিনিই ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’। সেই মর্যাদা না থাকলে পাশবিক প্রবৃত্তির বশে প্রাণীর বংশবিস্তার হতে পারে কিন্তু সভ্যতার সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় পরিবারকেও যারা শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে বিভাজনের স্বপ্ন এখনো দেখছে, তাদের কাছে শ্রীরামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ আপন তত্ত্বকে চুরমার হতে দেখা।

রামনবমীর উদ্‌যাপন দেখিয়ে দেয়, ভারত সেই পথেই চলবে, যে পথ ভারত নিজে প্রস্তুত করেছে, যে পথের লক্ষ্য তার চিরপরিচিত, যে আদর্শ ভারতের একান্ত নিজস্ব।

মন্দিরের ওপরে অত্যাচারী আক্রমণকারীর ধাঁচা নির্মাণ ভারতীয় মনে দাসত্ব গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা। অস্ত্রের আঘাত দেহকে ধ্বংস করেছে কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিকে নয়। ভক্তির বলে যে মনোবল সৃষ্টি হয় তা থেকেই ভক্তিকেন্দ্র উদ্ধারের শক্তি সৃষ্টি হয়। গোস্বামী তুলসীদাস মধ্যযুগে এই ভক্তিকে বাঁচিয়েছিলেন। শ্রীরামকে কাল্পনিক বলে ভক্তি থেকে সরিয়ে সমাজকে বিভক্ত করার অপচেষ্টাও দেখিয়েছে একটি গোষ্ঠী। শ্রীরাম বাঙ্গালির দেবতা না বিহারির দেবতা, ভক্তির দেবতা না যুদ্ধের দেবতা, এই নিয়ে অযৌক্তিক আলোচনা করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় মানসে অবিশ্বাস আর সন্দেহ ভরে দেবার চেষ্টা নতুন নয়।

ভারতের অনন্যতা তার পরিবার ব্যবস্থায়, আর পরিবার ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে পারিবারিক জীবন। সীতা-রাম জুটি এই পারিবারিক জীবনকে ধর্মের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পারিবারিক জীবনের বাধা রাবণরূপী শত্রুকে পরাজিত করেই পরিবারের রক্ষা সম্ভব। পরিবার হলো সমাজের একক। পরিবার বাঁচলে সমাজ বাঁচবে। সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে যারা সমাজকে ব্যাখ্যা করেছে তারা ভারতীয় সমাজকে বুঝতে ব্যর্থ। ধর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে তারা যেমন ভারতীয় সমাজকে ভাঙতে চেষ্টা করেছে, তেমনই সমাজের আধার ভারতীয় পরিবারের আদর্শ কর্তা শ্রীরামকে ভুলিয়ে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মূলে আঘাত করার চেষ্টাও করছে। মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিতে পরিবারেও শোষক-শোষিতের সম্পর্ক দেখতে

ফঃ ২

পায় কমিউনিজমের ধ্বজাধারীরা। পরিবার, রাষ্ট্র তাদের কাছে শোষণের যন্ত্রমাত্র। রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ভারতীয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ধারণাকে পুষ্ট করেছে বলেই তা রাষ্ট্রমন্দির।

ইতিহাসকে বিকৃত করে আর ভারতীয় সমাজের আদর্শকে ভুলিয়ে দিয়েই ভারতের মনোভূমিতে বিদেশি মতবাদের ধাঁচা নির্মাণের সম্ভাবনা দেখেছিল শ্রেণীসংগ্রামের সমর্থকরা। তাই সমাজের মন থেকে অর্থকেন্দ্রিক মতবাদের ধাঁচাকে গুঁড়িয়ে দিতেই রামমন্দির পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন ছিল। পিতৃসত্য রক্ষার্থে অনুজকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে চোদ্দ বছর বনবাসে কাটানো শ্রীরামচন্দ্র তাদের কাছে কাল্পনিক মনে হবে যারা বিশ্বের ইতিহাসকে শুধুমাত্র অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে, মানুষকে আর্থিক জীব মনে করেছে। ভারতীয় ইতিহাস লিখনের পরম্পরা শুধু ঘটনার বিবরণ নয়, ঘটনাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সমাজের পক্ষে হিতকর ভঙ্গিতে উপস্থাপন। পশ্চিমি মানসিকতা শুধু সাল, তারিখ ও ঘটনার বিবরণ চায়। তাই ইতিহাসের কাব্যরূপের বিভিন্ন রূপক-এ তারা বিভ্রান্ত। শ্রীরামকথার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাস যেরকম জীবন্ত, বিশ্বের আর কোথাও তা কল্পনার অতীত।

যাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাজ্য দখল ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলা, তাদের ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজও বহন করে চলেছে মথুরা, কাশী-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রাম, নগর, জনপদ। এদেশের রাজপথ, বাগান, শহর আক্রমণকারীদের নামে নামাঙ্কিত রাখাই কি সেকুলারিজম? ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই লোদি, তুঘলক, মুঘলদের মহান বানিয়েছে কারা?

কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা বরাবর ইসলামি কীর্তিকে মহান বলে দেখিয়েছেন। ইংরেজ শাসনকালে, ইংরেজদের লেখা ভারতবর্ষের ভুল ইতিহাস দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করে লিখেছেন, ''ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নের কাহিনিমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি-মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলের, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদিবা যায় কোথা হইতে আর-একদল উঠিয়া পড়ে— পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।''

তাহলে ইতিহাস লেখার দৃষ্টিকোণ কীরকম হওয়া উচিত? কবিগুরু লুঠেরাদের, বিদেশিদের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ভারতবর্ষের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত ইতিহাস চেয়েছেন— ''আমরা ভারতবর্ষের আগাছা- পরগাছা নহি; বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগুন্তকবর্গই যেন সব।''

যে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা শেখালেন মুঘলরাই এদেশে স্থাপত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, কবিগুরুর কথাগুলি কি তাদের মুখোপরি চপেটাঘাত নয়? — ''এরূপ অবস্থায় স্বদেশকে বিদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না--- ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এখন আমাদিগকে অশন-বসন, আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।'' ইতিহাসে বিদেশিদের বড়ো করে দেখলে স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তারপর ধীরে ধীরে শাসননীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদেশি তত্ত্বের জায়গা পাকা করতে সুবিধা হয় বলেই কি এরকম অপচেষ্টা হয়েছে দশকের পর দশক? তারপর এই দেশের শেকড়ে প্রাণের রস সঞ্চার করেছিলেন যে সব মহাপুরুষ তাঁদের ভুলিয়ে দিয়ে অফিসে, বাড়িতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পোশাকপরিচ্ছদে বিদেশীয়দের ছবি স্থান পায় দেশীয় মহাপুরুষদের স্থানে। তখন স্বদেশের সবকিছুকেই বদলে ফেলে বিদেশের ছাঁচে তৈরি করতে চায় যুব মন—এজন্যই কি ইতিহাসকে বিকৃত করে বিদেশি মতবাদ চাপিয়ে দেবার ব্লুপ্রিন্ট?

'ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া' যারা নকল পাঠ্যক্রম রচনা করে, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিকের উপাধি ধারণ করে, লুঠেরাদের নায়কের আসন দিয়ে দেশ ও ধর্মরক্ষায় প্রাণবলিদানকারী বীর ও বীরাঙ্গনাদের আড়ালেই রেখে দিলেন, তাদের কৃত্রিম জ্ঞান 'এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।' অনেক ক্ষতি হয়েছে। বিশ্বকবির ভাষায়, ''ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি।''

কিন্তু ইতিহাস বইতে কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ ঢুকিয়ে ভারতীয় মানসকে পরিবর্তনের চেষ্টার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয়দের প্রবহমান রামভক্তি। এই ভক্তির প্রবাহেই রামনবমীর উদ্‌যাপনে বিদেশীয় অনুকরণের ভারতকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা। আদর্শ ব্যবস্থার কল্পনা করে যেকোনো তত্ত্ব খাড়া করাই যায়, আর সেই স্বপ্নলোকের হাতছানিতে সমাজ বদলের সংকল্পে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুড়ে দেওয়াও সহজ। কিন্তু সেই অনিশ্চিত পথে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা নেই, বরং সেই পথ যে অসাম্য ও অন্যায়ের পথ, তা সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, কম্বোডিয়া ও কিউবার মতো দেশে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ কৃষক-শ্রমিকের হত্যালীলা দেখিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতবর্ষ প্রতিটি ব্যক্তিকে নৈতিকতার উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে সমাজে ন্যায় ও সমানতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে ঐতিহাসিক ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মাধ্যমে, তার নাম রামরাজ্য। কোনো স্বপ্নলোক নয়, নিজের ইতিহাস ও উদাহরণকে সামনে রেখে ভারতবর্ষ সেই সামাজিক উচ্চাবস্থা পুনরায় অর্জনের আহ্বান জানায়। একদিকে তত্ত্ব আর তার প্রয়োগের কুফলের ইতিহাস, আরেক দিকে ভারতের আদর্শ চরিত্রের ইতিহাস--- এই দুয়ের মধ্যে রামনবমী প্রতিবার দেখিয়ে দেয় ভারতবাসী কী চায়, আর ভারতের সহজাত আকর্ষণ কোন দিকে। রামনবমীর উদ্‌যাপন দেখিয়ে দেয়, ভারত সেই পথেই চলবে, যে পথ ভারত নিজে প্রস্তুত করেছে, যে পথের লক্ষ্য তার চিরপরিচিত, যে আদর্শ ভারতের একান্ত নিজস্ব। □

কালচারাল মার্কসিজম্

ভারতের ঐতিহ্য ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত

ড. অর্পণ দাস

কোনো দেশের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে স্বয়ং কার্ল মার্কস এবং ফ্রেজরিক এঙ্গেলস সেরকম একটা ভাবিত ছিলেন না। সংস্কৃতিকে তাঁরা একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু এ সম্পর্কে সেই অর্থে জ্ঞানগর্ভ কোনো দার্শনিক উদ্ভাস তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়েনি। তবে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এইসব সাংস্কৃতিক ধারণাগুলি সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা ব্যাখ্যা দেন। খুব স্পষ্টভাবে, মার্কস এবং এঙ্গেলস মনে করতেন শিল্প, সাহিত্য এবং বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতি শাসকের চেতনার রঙে রঞ্জিত হয়ে জনসমাজে সঞ্চারিত হয়। ১৮৫৭-'৫৮ সালে লেখা 'রাজনৈতিক অর্থনীতির রূপরেখা'-তে মার্কস হোমারের কাজকে মানব সভ্যতার শৈশবকালীন প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও আমরা জানি, আজও রামায়ণ ও মহাভারতের মতো হোমারও মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় (ইলিয়াড ও ওডিসি) রচনা করেছিলেন।

এ পর্যন্ত এটুকু বোঝা গেল যে, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে প্রথম পর্বের মার্কসবাদীরা খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। ফলে, তাদের কাছে তলস্তয় যেমন ছিলেন ফিউডালিজমের সাক্ষাৎ মূর্ত প্রতিরূপ, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেইপ্রকার বুর্জোয়া কবি। ভারতের প্রথমদিককার মার্কসবাদী মুজফ্ফর আহমেদ, ভবানী সেন প্রমুখ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানাবিধ কটূক্তি করেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সেসব শালীনতার সীমা পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়। ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' শীর্ষক গ্রন্থে তার বিস্তৃত নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার আত্মিক কাঠামো সম্পর্কে প্রথম দিককার মার্কসবাদীদের মনে গভীর অবিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের হাজার হাজার বছরের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও ধর্ম-দর্শনের প্রেক্ষিতটির গভীরে স্রেফ একটি ফিউডালিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট কাঠামো ভিন্ন তারা আর কিছুই খুঁজে পাননি। তাদের চোখে ধর্মপরায়ণতা, সম্মান, বীরত্ব এবং সামরিক চেতনা শাসক অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

এর পরিণাম হলো শোচনীয়। সমগ্র ইউরোপে, বিশেষত পূর্ব ইউরোপে মার্কসবাদী আন্দোলনগুলি একের পর এক ফ্লপ শোয়ের মেগা ইভেন্টে পরিণত হলো। তারা বুঝতে পারলেন সংস্কৃতিকে দেশ ও সমাজের প্রেক্ষিতে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলেই ইউরোপে মার্কসবাদ জনসমর্থন কুড়াতে অসমর্থ হয়েছে। ১৯২০-এর সময়কাল। পশ্চিমি মার্কসবাদীরা এই সময়ে বিভিন্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক দিকগুলির প্রভাব বিশ্লেষণের প্রতি জোর দিতে থাকেন। মুসোলিনির কারাগারে বন্দি আন্তোনিও গ্রামশি তার জেলখানার নোটবইয়ে যা লিখলেন তা সংস্কৃতি সম্পর্কে ধ্রুপদী মার্কসবাদের অবস্থান থেকে অনেকখানি দূরগামী হয়ে উঠল। তিনি সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরাসরি সংস্কৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করলেন। তিনি বললেন, সমাজে প্রচলিত শাসক শ্রেণীর মতাদর্শকে (Cultural hegemony) খণ্ডিত করতে হলে বিকল্প মতাদর্শ (Counter hegemony) খাড়া করতে হবে।

এই বিকল্প মতাদর্শ শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নয়; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই বিকল্প মতাদর্শই সমাজের শাসকবর্গের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের জন্ম দেবে। বস্তুত, 'সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ'-এর ধারণাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমন কিছু বুদ্ধিজীবীর নির্মাণ করতে হবে যাদের হাত দিয়েই এই বিকল্প হেজিমনি একটি প্রতিস্পর্ধী চিন্তাধারা বা ডিসকোর্স হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। গ্রামশির ভাষায় ওঁরা হলেন 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল'। গ্রামশির ভাবনায় সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যেই একটি যুদ্ধের ধারণা লুকিয়ে আছে। প্রথমে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই অবস্থাকে তিনি বললেন 'War of position' বা ধাপে ধাপে যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার কৌশল। দ্বিতীয় ধাপ হলো 'War of Maneuver' বা সরাসরি যুদ্ধ। এই অবস্থায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করতে হবে। আজ ভারতের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পথেই অগ্রসর হচ্ছে। সেসব স্থানে বিকল্প সংস্কৃতির আমদানির মাধ্যমে চিরাচরিত সংস্কৃতিকে দুর্বল করার কাজ চলছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব প্রথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এক প্রকারের দৃঢ় অবিশ্বাস সৃষ্টির কাজ চলছে যাতে চিরপ্রচলিত নিজস্ব প্রথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একপ্রকারের অবিশ্বাস সৃষ্টির কাজ চলছে যাতে চিরপ্রচলিত ধ্যানধারণাগুলি সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোয় দুর্বল হয়ে ওঠে। এসবের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশজুড়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

> **ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একপ্রকারের অবিশ্বাস সৃষ্টির কাজ চলছে যাতে চিরপ্রচলিত ধ্যানধারণাগুলি সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোয় দুর্বল হয়ে ওঠে।**

এদিকে, ২০-র দশকেই ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের তত্ত্ব জগতব্যাপী সাড়া ফেলে দিয়েছে। ভারতেও কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবি-লেখকেরা ফ্রয়েডের তত্ত্বকে নিয়ে নিজেদের সাহিত্য নির্মাণে প্রয়াসী হচ্ছেন। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় যে নতুনতর শিল্প-ভাবনা আমদানি করলেন তার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিল সাংস্কৃতিক মার্কসবাদের প্রথম

পর্যায়। নাট্য-বিনোদন এবং শিল্প-সাহিত্যেও শুরু হয়ে গেল কমপাইলিঙের কাজ। ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদ যেখানে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখ করল, সেখানে ফ্রয়েডবাদ পশ্চিমি সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন নিপীড়নের উৎস হিসেবেও চিহ্নিত করল। এর সঙ্গে যুক্ত হলো গ্রামশ্চির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ধারণা। মার্কসের দৃষ্টিতে মানুষ এতদিন ছিল একটি অর্থনৈতিক প্রাণী, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বললেন, মানুষ হলো একটি যৌন প্রাণী। উভয়ের লক্ষ্যই ছিল মানুষের সত্তাকে পশুত্বে নামিয়ে আনা। মার্কস ক্যাথিড্রাল তথা প্রার্থনা কেন্দ্রগুলিকে শোষণের প্রতীক হিসেবে দেখলেন এবং ফ্রয়েড এটিকে যৌন আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। সর্বোপরি, গ্রামশ্চি সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বাসকেই ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিলেন। এই প্রসঙ্গে লাতিন আমেরিকার 'Liberation Theology' আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করে। এই আন্দোলনে খ্রিস্টমতকে ব্যবহার করেই দারিদ্র্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ লড়াই করেছিল। এগুলির সঙ্গে যুক্ত হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অফ থট্। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অন্যতম চিন্তাবিদ ম্যাক্স হর্কহাইমার বললেন, একটি সমাজকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে হলে আগে তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দুর্বল করতে হবে। ব্যাস! শুরু হয়ে গেল খেলা। একে একে মাঠে নেমে পড়লেন জর্জ লুকাস, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন এবং থিয়োডর অ্যাডোর্নোর মতো চিন্তাবিদেরা। হার্বার্ট মার্কিউসের মতো চিন্তাবিদ মনে করতেন, শুধুমাত্র উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেই নয়, বরং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মার্কসবাদকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর পরবর্তী বেশ কয়েকটি দশক ধরে এইভাবেই চলল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দুর্বল করার কাজ। ব্যক্তি স্বাধীনতা, যৌন স্বাধীনতা ও ঐতিহ্যবিরোধী এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে কাজ করল সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র। থিয়োডর অ্যাডোর্নো ও হার্বার্ট মার্কিউসের মতো গবেষকরা যুক্তি দেন যে পশ্চিমি সভ্যতার ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ আসলে 'ফ্যাসিবাদী প্রবৃত্তির' উৎস। ১৯৫০-এর দশকে থিয়োডর অ্যাডোর্নো, এলস্ ফ্রেঙ্কল ব্রুন্সউইক, ড্যানিয়েল লেভিনসন এবং নেভিট স্যানফোর্ডের লেখা গবেষণা গ্রন্থ— The Authoritarian Personality সরাসরিভাবে পারিবারিক কাঠামো এবং ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে থাকল। তাদের যুক্তি এইসকল পারিবারিক কাঠামো এবং ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিই ব্যক্তিকে স্বৈরাচারী চিন্তাধারার দিকে ঠেলে দেয়।

বস্তুত জানিয়ে রাখা ভালো, হিটলারের উত্থানের পর জার্মানি থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ইহুদি চিন্তাবিদদের অনেককেই সেসময় আমেরিকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। মার্কিউস ছিলেন তাদের মধ্যেই অন্যতম। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে এই গোষ্ঠীটির নতুন ভরকেন্দ্র। ততদিনে, মার্কিউস আমেরিকায় হিপ্পি প্রজন্মের মানুষজনের কাছে একজন আদর্শস্বরূপ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে শুরু করেন। তারা ঐতিহ্যানুসারী সমস্ত কিছুর সঙ্গেই ফ্যাসিবাদের যোগসূত্র খুঁজতে আরম্ভ করেন। এই আক্রমণের ঝাঁঝ থেকে বাদ যায়নি গণমাধ্যমও। বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র সমস্ত কিছুর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে বার করতে আরম্ভ করেন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি। ১৯৬০-এর দশকে বার্মিংহাম স্কুল নামে পরিচিত একটি গবেষণা কেন্দ্র সাংস্কৃতিক মার্কসবাদকে একটি গবেষণা কেন্দ্র সাংস্কৃতিক মার্কসবাদকে একটি নতুনতর মাত্রায় নিয়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, সংস্কৃতি কেবলমাত্র শ্রেণী সংঘাতের প্রতিফলন নয়; এটি বর্ণ, লিঙ্গ, জাতীয়তা ও অন্যান্য সামাজিক উপাদানের মাধ্যমেও গঠিত হয়। স্টুয়ার্ট হল, রেমন্ড ইউলিয়ামস এবং ডিক হেবডিজের মতো গবেষকরা জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেন এবং প্রতিরোধের সম্ভাবনাগুলি অনুসন্ধান করেন। পরবর্তী সময়ে, সাংস্কৃতিক মার্কসবাদের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশই আজ এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র দ্বারা পীড়িত। বর্তমানে এই ন্যারেটিভটি শুধুমাত্র মার্কসবাদী চিন্তাধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মার্কসবাদের পাশাপাশি উত্তর-আধুনিকতাবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ, আইডেন্টিটি পলিটিক্স এবং লিঙ্গ রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কিত হয়ে গেছে।

এই প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, ধর্ম, পরিবার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটটিকে নির্মাণ করা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমগ্র ইউরোপ আজ দুর্বল। তাদের মজ্জায় মজ্জায় আজ ঘুণ ধরে গেছে। আন্তর্জাতিক প্রায় সমস্ত বিষয়ে আজ তারা আমেরিকার মুখাপেক্ষী। এই সর্ববিধ ব্যাধি ভারতবর্ষের বুকেও প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ ক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, প্রথা, মন্দির, বিগ্রহ, সর্বোপরি ধর্ম ও বিশ্বাসকে সুদীর্ঘকাল ধরে আক্রমণ করে আসছেন বামপন্থীরা। সাম্প্রতিককালে, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে হিন্দুধর্মকে দমনমূলক, বৈষম্যবাদী, ফ্যাসিবাদী, উগ্রবাদী, অবরোধমূলক এবং নারীবিরোধী ইত্যাদি ভূষণে তুলে ধরার প্রয়াস চলছে বিগত কয়েক দশক ধরে। সমান্তরালভাবে, লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা এবং মুক্তচিন্তার নামে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খাড়া করার চেষ্টা চলছে। হিন্দু জাতীয়তাবোধকে সাম্প্রদায়িক, অসহিষ্ণু ইত্যাদি তকমায় ভূষিত করে ভারতবাসীর জীবনে হিন্দুধর্মের ভূমিকাকে অনেকখানি লঘু করতে সমর্থ হয়েছেন কেউ কেউ। তাই কেউ কেউ আজ এই ধর্মকে ম্যালেরিয়া'র সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করতে পিছপা হচ্ছেন না। কেউ কেউ আবার 'অমৃতকুম্ভকে' 'মৃত্যুকুম্ভ'-এর সঙ্গে তুলনা টানছেন। এদিকে, রামায়ণ, মহাভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলিকে রূপকথা, গল্পকথা ইত্যাদি বলে লোকজীবনে এইসকল গ্রন্থগুলির গুরুত্বকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত আজকের নয়, এ চক্রান্ত বহুকালের। আজও অ্যাকাডেমিক স্তরে বহু বামপন্থী অধ্যাপক ও স্কলারেরা এই সকল গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলে স্বীকার করতে চান না। আজ হিন্দু সমাজের বর্ণ-ব্যবস্থাকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আইডেন্টিটি পলিটিক্সকে। সেক্যুলারিজমকে দাঁড় করানো হচ্ছে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে। এরা জাগরণ মঞ্চের পরাবর্তন ক্রিয়ায় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ খুঁজে পান আর যখন হিন্দুদের ইসলাম কিংবা খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করা হয় তখন সেটি এদের কাছে হয়ে ওঠে মানবাধিকারের বিষয়। ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিল্প-সাধনার বিপরীতে এরা দাঁড় করাতে চান পশ্চিমি সংস্কৃতিকে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ এই সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। গ্রামশ্চির পথ অনুসরণ করে এইসব কেন্দ্রগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে ন্যারেটিভ ওয়ারফেয়ারের জন্য। আগামীদিনে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কালচারাল মার্কসিস্টদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। এইসবের বিপরীতে, সঠিক ইতিহাসের চর্চা, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণ ব্যতীত জাতীয় ঐক্য গঠন করা এক দুরূহ কাজ হয়ে উঠবে হিন্দুদের কাছে। প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবার আজ যদি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন না হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই হিন্দুদের সেই পরিণতি হবে যে পরিণতি আজ ইউরোপকে ভিতর থেকে শেষ করে দিয়েছে।

(লেখক সহকারী অধ্যাপক, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়)

বীরত্বের দিব্যরূপই তাঁর স্বরূপ, মহাবীর হনুমানে তাই আস্থা শ্রীরামচন্দ্রের

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

উদীয়মান বলার্কের মতো কান্তিমান পবনন্দন, বানর শিরোমণি হনুমান। তাঁর বর্ণ অশোক ফুলের মতো, তাঁর চোখ সোনার মতো, তিনি বিপুল এবং বিশাল। শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে দূত হয়ে তিনিই গিয়েছিলেন লঙ্কায়। বীর্য ও ধৈর্যের আধার তিনি; তিনি প্রভুভক্ত, বানরোত্তম, বলবীর্যশালী দৈব্যসত্তা। জনকদুহিতা সীতাদেবীর খবর নিয়ে আসতে তিনি সক্ষম। শতযোজন সাগর অতিক্রম করতেও তিনি কৃতবিদ্য। তাই তিনি লঙ্কা অভিমুখে গমন করলেন। সাগর গোষ্পদ বিবেচনা করে তিনি কৃতকার্যও হলেন।

লঙ্কায় অশোক-কাননে সীতাদেবীর দর্শন পেলেন তিনি। শ্রীরাম বিরহে-চিন্তনে সতত নিমগ্ন সীতা; শোকাতুরা, একবেণী হয়ে বসে আছেন। চারিদিকে শক্তিশালী রাক্ষসীর দল ঘিরে রয়েছে তাঁকে। সময় উপযুক্ত বুঝে বৃক্ষে উপবেশন করেই সংস্কৃত ভাষায় সীতাদেবীর শ্রবণ-গোচরের জন্য মধুর বচনে শ্রীরাম কাহিনি বিবৃত করতে লাগলেন। হনুমানের ভয়ংকর রূপ দর্শনে প্রথমে সীতাদেবী মূর্চ্ছা গেলেন। পরে জ্ঞান ফিরলে আশ্বস্ত হয়ে কথোপকথন হলো। হনুমান জানালেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দূত, তিনি বানর রাজ সুগ্রীবের সচিব। প্রমাণস্বরূপ শ্রীরাম-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় সীতাদেবীকে দেখালেন। বললেন, কমললোচন রাম সীতাদেবীর সংবাদ পেলেই যক্ষ ও বানরসৈন্য সমেত লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। সীতাদেবীকে উদ্ধারও করবেন তিনি। দু'জনের সাক্ষাতের প্রমাণস্বরূপ আপন শিরোরত্ন কাপড়ের মধ্যে থেকে বার করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করতে হনুমানকে অর্পণ করলেন সীতা। সেই সঙ্গে শোনালেন, চিত্রকুট পর্বতের উপবনে সংঘটিত বাম-সীতার একান্ত গোপন এক ঘটনা, যা শুনে রামচন্দ্র বুঝতে সমর্থ হবেন, সত্যিই হনুমানের সঙ্গে সীতাদেবীর সাক্ষাৎ হয়েছে।

সীতাদেবীকে নিজের পৃষ্ঠে স্থাপন করেই রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করতে সক্ষম ছিলেন পবননন্দন। কিন্তু তাতে শ্রীরামের যশোহানি ঘটতো। গমনের বেগে সীতাদেবী সমুদ্রে পড়ে যেতেও পারতেন। রাক্ষসগণও পশ্চাদ্ধাবন করে সীতাদেবীকে আক্রমণ করতেও পারতো। যেহেতু যুদ্ধে জয়-পরাজয় সুনিশ্চিত নয়। তাই বিবেচনা করে সীতা একলা হনুমানের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। বললেন, রাবণ ও অন্যান্য রাক্ষসবধ করেই যেন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

সীতাদেবীর সাক্ষাৎ পাবার পর অতিরিক্ত কার্য হিসেবে প্রবল পরাক্রমে ভয়াবহ মূর্তিতে লঙ্কানগরীকে ত্রস্ত করে তুললেন হনুমান। শত্রুপক্ষের বল যাচাই করতে গেলে বল

প্রয়োগ করেই দেখে নেওয়া উচিত। এই বিবেচনা করেই রাক্ষস-সংহারে নামলেন তিনি। সংগ্রামের সময় শত্রুর সামর্থ্য কীরূপ, তা তো জানা দরকার! তখন বারণের প্রমোদ-কানন অশোক-বন বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন। শুরু হলো বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন এবং বৃক্ষভঙ্গের সহস্র ঘটনা। তাতে রাক্ষসীদের নিদ্রা গেল টুটে। খবর গেল রাবণরাজার কাছে। ভয়ংকর ক্রোধে চিতার আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন রাবণ। এদিকে হনুমান উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, রঘুবীরের জয়, মহারাজ সুগ্রীবের জয়, 'জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।/রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেনাভিপালিতঃ।।'

হনুমান লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কখনো লৌহ-তোরণ খুলছেন, কখনো প্রাসাদ দগ্ধ করে দিচ্ছেন। রথযুদ্ধে ধাবমান জম্বুমালীকে সহজেই নিহত করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসা মন্ত্রীপুত্রদের সসৈন্যে বধ করলেন। গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করে বধ করলেন বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘস, ভাসকর্ণ নামক পঞ্চ সেনাপতিকে। ঘোড়া দিয়েই ঘোড়া মারছেন, হাতি দিয়েই হাতি। সৈন্য দিয়ে সৈন্যদের মারছেন এক এক করে। আর নবোদিত সূর্যের মতো কান্তিময় রাবণপুত্র অক্ষের চরণদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরে সহস্র-ঘূর্ণন সম্পন্ন করে নিক্ষিপ্ত করলেন দূরে, সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল কুমারের দেহ। তার আগেই চপেটাঘাতে বধ করেছেন কুমারের অষ্ট অশ্ব। এবার রাবণের আহ্বানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধরথে চড়ে এলেন। তার ব্রহ্মাস্ত্রে অবশেষে নিশ্চেষ্ট হবার ভান করলেন হনুমান। তখন রজ্জুতে বেঁধে কটূক্তি করতে করতে রাক্ষসেরা তাঁকে রাবণের সভায় নিয়ে গেল।

রাবণ ভয়ংকর ক্রুদ্ধ। তিনি অনতিবিলম্বে হনুমানকে বধ করতে চান। কিন্তু দূতকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না! এ নীতি বিরুদ্ধ কাজ, সতর্ক করলেন বিভীষণ। কিন্তু অন্য দণ্ড তো দেওয়া যেতে পারে! তাই রাবণ আদেশ দিলেন, হনুমানের লেজে কার্পাস বস্ত্র জড়িয়ে জ্বালানি তেল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করতে। এ শাস্তি কিন্তু লঙ্কানগরীর পক্ষে আদৌ সুখকর হলো না। দেহ পরিবর্ধন করে জ্বলন্ত লেজ দিয়েই তিনি গোটা লঙ্কা ছারখার করে ছাড়লেন। গৃহ পুড়ছে, রাক্ষসেরা মরছে, চারিদিকে উচ্চ-রোদন। প্রাসাদ-তোরণ দগ্ধ। তার মধ্যেই সীতাদেবী রক্ষা পেয়েছেন। আর সীতাদেবীরই ইচ্ছায় ও প্রার্থনায় হনুমানের লেজ আগুনে দগ্ধ হলো না। লঙ্কাকাণ্ড করে অবশেষে তিনি সমুদ্রে ডুবিয়ে লেজের আগুন নেভালেন।

এবার তিনি লম্ফ দিয়ে সাগর লঙ্ঘন করে ফিরবেন। তাই উঠেছেন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল অরিষ্ট পর্বতে। ত্রিশ যোজন উচ্চ এবং দশ যোজন বিস্তৃত সেই পর্বত। তখন কেমন লাগছে তাকে? যেন পর্বতের বনরাজি হয়েছে তাঁর বসন, যেন পর্বত শৃঙ্গে সম্পৃক্ত অভ্ররাজি তাঁর উত্তরীয়, যেন পর্বতগাত্রে নির্ঝর-ধৌত ধাতব-শিলা হয়েছে তাঁর চোখ। ক্রমশ তাঁর দেহ বাড়িয়ে তুলছেন প্রস্তুতি নিয়ে। সেই চাপ পর্বতের সইতে পারা সহজ কথা নয়! শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শিলাবাসী প্রাণীসকল মহাত্রাসে রসাতলে যাচ্ছে। গুহাবাসী সিংহগর্জন মনে হচ্ছে যেন মহাআর্তনাদ। পর্বতবাসী গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধরদের অবস্থাও তথৈবচ। তাঁরা অন্তরীক্ষে সাময়িক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন এ যাত্রায়। সমগ্র পর্বত ভূতলে প্রবিষ্ট হতে বাকি নেই। এবার তিনি মহালম্ফ দিয়ে উচ্চ আকাশে উঠলেন। তিনি নিজেও যেন এক সপক্ষ-পর্বত। কী অসীম শক্তি! এদিকে গগনতলে সাগরের অসীমতা। ওদিকে আকশে নানা বর্ণের মেঘ। এই শোভন-সাগরের উপরে অভ্র-জালিকা ভেদ করে মহাবেগে বীর হনুমান এগিয়ে চলেছেন। সেই ঘন মেঘ জালিকার মধ্যে কখনো তাঁর দৃশ্যরূপ, কখনো অদৃশ্য। মধ্য পথে মৈনাক পর্বত ছুঁয়ে তিনি মহেন্দ্র পর্বত দেখতে পেলেন। সমুদ্রের উত্তর কিনারে তারই জন্য প্রতীক্ষারত জাম্ববান প্রভৃতি বানরবাহিনী। তাদের দেখে তিনি মেঘের মতো গর্জন করছেন। পর্বতগুহার মধ্যে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট বায়ু যে শব্দ সৃষ্টি করে, এ তেমনই গর্জন। এ হর্ষ নিনাদ! এ নিনাদ কৃতকার্যে সফলতার বার্তা, বুঝতে পেরে বানরকুল আনন্দে আত্মহারা হলেন। তারা বৃক্ষশাখা থেকে শাখান্তরে, শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে লম্ফঝম্প করে তাদের আনন্দ- অনুভূতি প্রকাশ করতে লাগলেন। হর্ষে, প্রতি হর্ষে চারিপাশ পরিপূর্ণ। এমনই আনন্দ-গর্জনের মধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের ঝরনামালায় আকাশ থেকে পতিত হলেন পবননন্দন। বানরেরা আনন্দিত। সেই রমণীয় বনপ্রদেশের মধ্যে তারা বৃক্ষশাখা চয়ন করে পেতে দিলেন আসন, ভোজনের জন্য উপহার দিলেন সুস্বাদু ফলমূল। বানরকুলের আনন্দ-অন্তর দেখে কে!

(শ্রীহনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

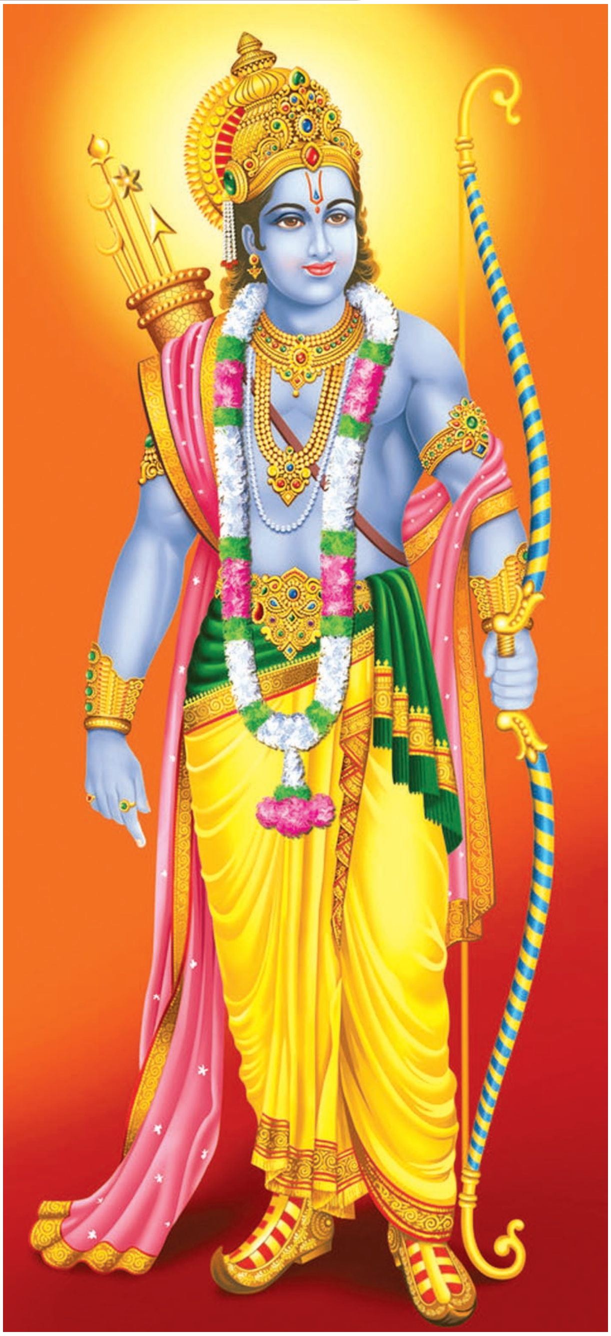

হিন্দু জীবনচর্যার মূর্তপ্রতীক শ্রীরাম

সুব্রত ভৌমিক

দেশের উত্থানে ঘরে ঘরে শ্রীরামের পূজা চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী রামায়ণ-মহাভারতকে মিথ বা কল্পকাহিনি বলে থাকেন। ঈশ্বর আমাদের সুবুদ্ধি দিন, যাতে আমরা কখনো মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে কল্পচরিত্র বলে অবহেলা করার ধৃষ্টতা না দেখাই।

হিন্দু জীবনচর্যার মূর্ত প্রতীক

আমাদের সুপ্রাচীন সনাতন সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য যা বিশ্বে হিন্দুধর্ম বা সনাতনধর্ম নামে পরিচিত এবং যাকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক না বলে 'জীবনচর্যা' রূপে অভিহিত করেছে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাম হচ্ছেন সেই জীবনচর্যার মূর্ত প্রতীক বা ঘনীভূত রূপ (Embodiment or Condensed form of that way of life)।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তার প্রতীক

শ্রীরাম শুধু অযোধ্যায় নয়, উত্তর ভারতের নয়, বরং সারা ভারতের। রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্বিশেষে যুগ যুগ ধরে ভারতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তা পরিব্যাপ্ত। সেই সাংস্কৃতিক ঐক্যের অকাট্য প্রমাণ রূপে সারা ভারতে শ্রীরাম সদাচার ও সংস্কৃতির প্রতীক আর রাবণ পরস্ত্রী হরণকারী বা দুরাচার ও বিকৃতির প্রতীক। তাই সারা ভারতে সন্তানের নাম রাখার সময় অধিকাংশ নাম রামকেন্দ্রিক হয়, রাবণ কেন্দ্রিক নয়।

শুধু তাই নয়, শ্রীরাম একজন ভারতীয় রাজা হয়েও মঙ্গোলিয়া, চীন থেকে শুরু করে মুসলমান অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে বন্দিত ও পূজিত। নিজের জীবদ্দশায় প্রায় পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ দখলকারী চেঙ্গিস খানও নিজের দেশ মঙ্গোলিয়াতে এইভাবে বন্দিত হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'শ্রীরাম আমাদের ঘরের জনের থেকেও আপনজন।'

প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতীক

শ্রীরাম সেই গণতন্ত্রের প্রতীক যেখানে একজন ব্যক্তিরও মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। বরং আজকের গণতন্ত্রে তো ১০০ জনের মধ্যে ৫১ জন মূর্খ বা স্বার্থপরের মতই প্রতিষ্ঠা পায়। ৪৯ জনের সততা, মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই। একজন সাধারণ প্রজা দেবী সীতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করায় শ্রীরামচন্দ্র তাকে কঠোর শাস্তি না দিয়ে বরং তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। এজন্যই গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছিলেন— 'আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত সীমা হলো রামরাজ্য।'

বহুত্বের প্রতীক

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্য বা বহুত্বের দেশ। শ্রীরাম সেই বহুত্বকে মর্যাদা দিয়েছেন। দিগ্বিজয়ের সময় তিনি স্থানীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে পরাজিত সমস্ত রাজাকে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকী তিনি বিভীষণকে স্বর্ণলঙ্কার

উত্তরাধিকারী করেছেন। অর্থাৎ শক্তিশালী কেন্দ্রের পাশাপাশি শক্তিশালী রাজ্যের ভারতীয় পরম্পরার পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীরাম। এজন্য রামমনোহর লোহিয়া শ্রীরামকে 'একতার প্রতীক' বলেছেন।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রতীক

সারা পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মানুষ যখন নোম্যাডিক বা অর্থসভ্য অবস্থায় ছিল, যাযাবর অবস্থায় ছিল, সেই সময়েই লক্ষ্মণ শ্রীলঙ্কার বৈভবে মুগ্ধ হয়ে সেখানে থাকতে চাইলে শ্রীরামের মুখ থেকে নিঃসৃত হয় সেই অমর বাণী 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে রোচতে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সি।।' জন্মভূমির প্রতি এই টানই তো পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয়তাবোধ রূপে বিকশিত হয়। মাতৃভূমির প্রতি মাতা-পুত্রের সম্পর্কই রাষ্ট্রীয়তার পরিচায়ক।

সামাজিক সমরসতার প্রতীক

বর্ণাশ্রম অনুযায়ী, ক্ষত্রিয় হয়েও শ্রীরাম বনবাসকাল শুধু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষিদের সাহচর্যেই কাটাননি। দণ্ডকারাণ্যের তথাকথিত বনবাসীদের সঙ্গে আহার-বিহার করেছেন, বন্ধুত্ব করেছেন। গুহক চণ্ডাল ও শবরীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন, যা এককথায় বৈপ্লবিক।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন অর্থাৎ কঠোর প্রশাসনের প্রতীক

শ্রীরাম একদিকে যেমন রাবণ ও বালিকে বধ করেছেন, অন্যদিকে অসুরদের অত্যাচার থেকে মুনি-ঋষি ও তাঁদের সাধনাস্থল আশ্রমগুলিকে (যা বর্তমানের যে কোনো শিক্ষাকেন্দ্রের মতো) রক্ষা করেছেন। আজ চারদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়বাড়ন্ত। যখন অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিতরা শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালন সমিতির মাথা হয়ে অনাচারে মগ্ন, আবার প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা আফজল গুরু ও কাশ্মীর, মণিপুর, নাগাল্যান্ডের 'আজাদির' সমর্থনে সভা করে বা শিক্ষক-অধ্যাপকদের অপমান করে, নেশা তথা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় তখন এটা স্পষ্ট যে এসব জিন্স পরিহিত আধুনিক অসুরদের জন্য শ্রীরামের মতো কঠোর প্রশাসকের একান্তই প্রয়োজন।

প্রকৃত ক্ষাত্রবুদ্ধি ও বিজিগীষু মনোভাবের প্রতীক

বুদ্ধিমান মানুষের হৃদয়ে জয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। শ্রীরাম এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। নারীহত্যা ক্ষাত্রধর্মের পরিপন্থী হলেও তিনি তাড়কাকে বধ করেছেন। গাছের আড়াল থেকে বালিকে বধ করেছেন। কারণ আঁততায়ী স্ত্রী হোক বা পুরুষ, তাকে বধ করে শান্তি স্থাপন করা, অধর্মের নাশ করাই ধর্ম। শ্রীরামের এই প্রকৃত ক্ষাত্রবুদ্ধি অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ না দিয়ে জরাসন্ধকে ও চাণক্য ধননন্দকে এবং ছত্রপতি শিবাজী আফজল খাঁকে বধ করেছেন। কল্পনাবিলাসী, বিদেশি ভাবনায় আপ্লুত নেহরু শ্রীরামের এই প্রকৃত ক্ষাত্রবুদ্ধি অনুসরণ না করায় চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়।

হিন্দু সমাজ উদারতা ও অহিংসার নামে একধরনের কাপুরুষতায় আক্রান্ত। বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখলে মনে হয় তারা যেন বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে বসবাস করছে। হিন্দুদের এই দুরবস্থা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি, বৃন্দাবন লীলাফিলা এখন রেখে দে।' এবং 'দেশটাকে এখন তুলতে হবে, মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে।'

আজ চীন যেমন চারদিক থেকে ভারতকে ঘিরতে চাইছে, তেমনই দেশের ভিতরেও ডিপস্টেট চীন-পাকিস্তানের দালাল ও অর্থে পরিপুষ্ট। জাতপাত, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির বেসাতি করা নেতা, মাওবাদী ও কমিউনিস্ট, ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী, আইএসআই এজেন্ট দেশের ক্ষতি করতে সচেষ্ট। তাই শ্রীরামের গুণাবলীর সামান্য কিছু আত্মস্থ করে এবং প্রকৃত ক্ষাত্রবুদ্ধি প্রয়োগ করে ঘরে-বাইরের এই ধর্মযুদ্ধে জয়ী হতে আমরা যেন অবশ্যই সচেষ্ট হই। শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন যেন 'বারো মাসে তেরো পার্বণে'র মতো আরও একটি উৎসবে পরিণত না হয়। শ্রীরামনবমীর এই পবিত্র তিথিতে আমাদের অঙ্গীকার হোক রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

বিশেষ সূচনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একশত বছরে স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে যথাক্রমে আগামী ১২, ১৩ ও ২০ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। প্রচার প্রতিনিধিদের নিজের নিজের প্রান্তের নির্দিষ্ট বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

দক্ষিণবঙ্গের বৈঠক ১২ এপ্রিল, ২০২৫, শনিবার, সকাল ১০টা

স্থান : আস্থা চিলড্রেন্স অডিটোরিয়াম
অরবিন্দ সরণি, হাতিবাগান, কলকাতা-৬

মধ্যবঙ্গের বৈঠক ১৩ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা

স্থান : ছাই রোড, ভারতমাতা মন্দির
সঙ্ঘ কার্যালয়, ধাধকা নর্থ পুলিশ স্টেশন, আসানসোল

উত্তরবঙ্গের বৈঠক ২০ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা

স্থান : মাধব ভবন, ৩৯, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোড,
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

ভারত মহাসাগরের নীচে বিশাল গর্ত কেন?

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে, শ্রীলঙ্কার ঠিক দক্ষিণে এবং মালদ্বীপের ঠিক পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেকটাই দুর্বল। যার ফলে এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় একশো মিটার গভীরে নেমে গেছে। একশো মিটার মানে প্রায় একটা ২৫ তলা বাড়ির সমান। এই অচলকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন গ্রাভিটি হোল বা মাধ্যাকর্ষণজাত গর্ত। এর বিস্তৃতি প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, মাধ্যাকর্ষণ বেশি হলে চুপসে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখানে কেন উলটো হচ্ছে? একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। একটি চুম্বককে লোহার গুঁড়োর মধ্যে ডুবিয়ে তুলে আনলে দেখা যাবে যে অংশে আকর্ষণবল বেশি সেখানে বেশি পরিমাণ গুঁড়ো আটকে আছে, তা সে চুম্বকটি যেভাবেই রাখা হোক না কেন। তেমনি মাধ্যাকর্ষণ বল যেখানে বেশি সেখানকার জল টেনে নেওয়ায় গ্রাভিটি হোলে জলস্তর নেমে গেছে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে এর সৃষ্টি হলেও এটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৪৮ সালে। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের গবেষক দেবাঞ্জন পাল এবং আত্রেয়ী ঘোষ এই রহস্যের একটা কিনারা করার চেষ্টা করেছেন বটে তবে এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিকস্তরে তেমন সমর্থন মেলেনি। এখনো বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অজানা। বিজ্ঞানীদের দাবি একসময় অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ভূগর্ভস্থ লাভা প্রচুর পরিমাণে সরে যাওয়ায় এই অঞ্চলে ভূভাগের ঘনত্ব কমে এসেছে। তার কারণে এখানে মাধ্যাকর্ষণ কম। সমুদ্র এখানে অনেকটা মজে যাওয়া ডোবার মতো। তবে গ্রাভিটি হোল নিয়ে এখনো অনেক রহস্য রয়েছে।

—অজয় ভট্টাচার্য,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য

আম আদমি পার্টির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের বিদায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনারকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আগামী তিনমাসের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ডবল ইঞ্জিন সরকারের এটাই প্রথম হুইসেল। দিল্লি দাঙ্গায় জড়িতদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। দেশবাসী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকারীরা স্থান পাবে না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তাদের জন্য স্বর্গরাজ্য। এ রাজ্যে রাতারাতি তৈরি হয় গুলশন কলোনি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বহু জায়গাতেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে বাধার সম্মুখীন হতে হয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে। এই সব ক্ষেত্রে শাসক দলের মদতও লক্ষ্য করা যায়। এর পিছনে রয়েছে ভোটব্যাংকের রাজনীতি। অনুপ্রবেশকারীরা চলে গেলে শাসক দলের ভোটব্যাংক শূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এবং অনুপ্রবেশকারীরা যৌথভাবে কেন্দ্র সরকারকে উৎখাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এরাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র গেরুয়া করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা শাসকদলের ডান-বাম দুই হাতই। এর জন্য বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ভোটব্যাংক অক্ষত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে সারা দেশে এনআরসি চালু করা প্রয়োজন। রাজ্য তথা দেশের স্বার্থে অবিলম্বে এনআরসি চালু করে অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের হাত থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হবে।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
খয়রামারি, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

দ্রাবিড় ও তামিল নাম দুটি সংস্কৃত থেকে এসেছে

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন হিন্দি ও সংস্কৃতভাষার বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। তিনি যে ভৌগোলিক অঞ্চলে থাকেন তা দ্রাবিড় এবং যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তা তামিল বা তামিলনাড়ু নামে পরিচিত। দ্রাবিড় ও তামিল শব্দ দুটিই সংস্কৃতভাষা থেকে এসেছে।

সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত থাকে। সংস্কৃতে দ্রবীভূত জলকে দ্রব বলা হয়, বাংলাতেও তাও। এই অর্থে সমুদ্রকে দ্রব নামে চিহ্নিত করা যায়। সংস্কৃতভাষায় মিল শব্দের অর্থ মিলে যাওয়া বা মিলিত হওয়া। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর এই ভূখণ্ডের সঙ্গে মিলে রয়েছে। এক্ষেত্রে যে ভূখণ্ড বা দেশের সীমানা দ্রবের সঙ্গে মিলে গেছে, সে দেশ দ্রবিল। এই দ্রবিল কথাটিই উচ্চারণের বিবর্তনে দ্রবিড়, দ্রবিড় হয়ে দ্রাবিড় হয়েছে।

প্রাচীনকালে দ্রাবিড় বলতে তামিলনাড়ুও কেরালাকেই বোঝাতো। পরবর্তীতে এর সীমানা বৃদ্ধি হয়ে অন্ধ্র-কর্ণাটক হয়ে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বর্তমান ভূগোল অনুযায়ী সাধারণত কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানার ভূভাগকেই উপদ্বীপীয় ভারত বলা হয়। তিন দিকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগকেই উপদ্বীপ বা উপদ্বীপীয় দেশ বলে।

প্রাচীন দ্রাবিড় দেশের যে অংশে বঙ্গোপসাগরগামী ঐতিহ্যবাহী পবিত্র তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিত, সে দেশ তামিল নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, তাম্রপর্ণী নদীর তীরে রয়েছে অগস্ত্যমুনির পাপনাশন তীর্থ। তাম্রপর্ণী বা তাম্র থেকে তামিল হয়েছে। তামিলের সঙ্গে দেশবাচক নাড়ু শব্দ যোগ হয়ে তামিলনাড়ু হয়েছে। তামিল বলতে যেমন স্থান বোঝায়, তেমনি ভাষাও বোঝায়। দ্রাবিড়ের নেপথ্যে রয়েছে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ড এবং তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিত

ফঃ ৩

রাজ্য। অতএব দ্রাবিড় ও তামিল নাম দুটি সংস্কৃতভাষা থেকেই এসেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—রাজকুমার জাজোদিয়া
কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর।

এক শ্রেণীর সবজান্তা বাঙ্গালি

আমরা সবজান্তা বাঙ্গালি। যেটাই বলুন না কেন সেটাই আমরা জানি। তোমরা? কিছুই জানো না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) -এর নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা এই সংস্কৃতি তৈরি করেছে। সিপিআই(এম)- কে উৎখাত করার দাবিদার তৃণমূল এখন সিপিআই(এম) -এর ছেড়ে যাওয়া ছেঁড়া চটি পড়ে ঘুরছে। ওরা জানে গান্ধীজীকে কে মেরেছে। কিন্তু জানে না তেগবাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের নাবালক পুত্রদের কে মেরেছে। ওরা আরও জানে না যে, বীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের স্ত্রীকে কারা ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। ওরা জানে ও গর্ব করে বলে থাকে যে, নেতাজী হিন্দু মহাসভার বিরোধী ছিলেন। হিন্দু সংগঠন পছন্দ করতেন না। কিন্তু জানে না যে, নেতাজী এক সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্থাপক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ভীষণ অসুস্থ ডাক্তারজী ঘুমিয়ে থাকায় নেতাজী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। এসব তথ্য বামপন্থীরা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে।

এ যাবৎকাল আমরা যে ইতিহাস পড়েছি তা ইংরেজ ও বামপন্থীদের তৈরি করা ইতিহাস। সেখানে যত বড়ো করে ইসলামি শাসনের কথা রয়েছে, তার তুলনায় খুব সামান্যই পড়ানো হয় মুসলিম শাসনের আগের হিন্দুদের গৌরবময় ইতিহাস। ওরা ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের শিখিয়েছে হিন্দুদের কুপ্রথা ছিল সহমরণ ও বাল্যবিবাহ। ঠিক কথা। এসব অবশ্যই কুপ্রথা। প্রশ্ন,এখানে কেন পড়ানো হয় না মুসলমানদের তিনতালাক প্রথা এবং মুসলমান পুরুষদের একাধিক বিবি রাখার কথা। আসলে এসবই ছিল কৌশলে হিন্দুদের ছোটো করে দেখানো। দেশের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে সব প্রদেশ থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেয়েছিল। শুধুমাত্র মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর একতরফা জেদের কারণে জওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী করতে বাধ্য হয় কংগ্রেস। সেদিন থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের ছোটো করে দেখানো আর মুসলমান তোষণ করা।

তাই আজ সবাই জানে অযোধ্যার সেই কলঙ্কিত ধাঁচা কারা ভেঙেছে। কিন্তু সবাই জানে না নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কে ধ্বংস করেছিল। কে শ্রীরামজন্মভূমিতে রামমন্দির অপবিত্র করেছিল। যখনই সত্য ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, তখনই ইতিহাসের গৈরিকীকরণের ধুয়ো তুলে কংগ্রেস-বাম, লালু-মমতা-অখিলেশ-স্ট্যালিনরা রে রে করে মাঠে নেমে পড়েছে। তার বিষময় ফলে আজ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের এই অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশ পাহারায় সরস্বতী পূজা করতে হয়।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি, হাওড়া-৯।

হিন্দুসমাজ ও দেশকে ধ্বংস করছে সেকুলারিজম

দল ভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতি, শ্রেণী ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, নারী আন্দোলন, জাতি-উপজাতি সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন— এগুলো সব ফ্র্যাকশনালিজম্। ন্যাশনালিজম্ বা জাতীয়তাবোধকে ভাঙার কৌশল। সময় সময় কম-বেশি সবাই নানা সেন্টিমেন্ট উসকে দিয়ে এসেছে ১৯৪৭-এর পর থেকেই। স্বাধীনতার পর উচিত ছিল জরুরি অবস্থা জারি রেখে ৫০ বছর সামরিক বাহিনীর শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তারপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির করালগ্রাসে চলে গেল ভারত। রাষ্ট্রবিরোধী নেতারা বলল— ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাও। তারপর খণ্ডিত ভারতেও ওয়াকফ চাও। মুসলিম ল' বোর্ড চাও। ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরির পর যেখানে একটা ঘাসও দাবি করার অধিকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেই সস্তা ভোটের রাজনীতি দুধেল গাইদের প্রশ্রয় দিয়েই রেখেছে। দুর্নীতি, শোষণ, অপশাসন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের অপসংস্কৃতি জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। আর কি বিদেশি, বিধর্মী জঞ্জাল সাফ করার জন্য দেশপ্রেমিকদের খাঁটি বাহিনী পাওয়া যায়? চারিদিকে অসংখ্য জয়চাঁদ। লক্ষ লক্ষ ধননন্দ। শত শত অম্ভী আর মানসিংহের ভিড়ে রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, পৃথ্বীরাজ চৌহান অসহায়। বিদেশি, বিধর্মী ইকোসিস্টেমের প্রভাব বজায় রয়েছে বকলমে। মুখে মুখে স্বাধীনতা। বাস্তবতা উলটো। হিন্দু নিজের দেশেই অনাকাঙ্ক্ষিত। শরণার্থী। ঘোরি, খলজি, ঔরঙ্গজেবের বংশধররাই সব নাগরিক অধিকার ভোগ করছে। প্রিভিলেজড্ বাই রেগুলেশনস্। এরপরও আমরা সেকুলার! কত বড়ো মূর্খতা! সবার উপরে মানুষ সত্য, এই কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যারা অমানুষ? তাদের জন্য তো এই কথা নয়।

যত মত তত পথ— এই কথা তাঁদের জন্য, যাঁরা এই কথাকে মানে। যারা মানে না, তাদের জন্য নয়। যাদের হাতে ওপার থেকে মার খেতে খেতে প্রায় মরে, ধর্ষিত-অপহৃত হয়ে, ভিটেমাটি চাঁটি হয়ে এপারে এসে জুটলে সেই তাদেরকেই কিনা ভাই পাতাচ্ছে? জামাই করছে? এরকম নির্লজ্জ জাত তো চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেই তৃপ্ত। তাদের পক্ষে দেবতার পূজা করা বৃথা। ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক, লম্পট, দুশ্চরিত্র, লোভী, প্রতারক, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকের জাত নিজের জাতের বীর-বীরাঙ্গনাদের বিদেশি- বিধর্মীর হাতে তুলে দেয় আর নিজেদের ধার্মিক প্রমাণ করতে ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করে। দেবতা বিশ্বাসঘাতকদের রক্ষা করতে আসেন না। বিধর্মী, জেহাদিদের হাতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ হয়। তাদের হাতে মন্দির ভাঙচুর ও ধ্বংস হয়। হিন্দু মঠ-মিশন লুণ্ঠন হয়। নারীর সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হয়। সেকুলাররা তবুও মিথ্যা মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেদের বিবেককে নির্লজ্জভাবে বলি দেয় অধর্মের যূপকাষ্ঠে।

—অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়,
নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা।

আদর্শ হিন্দু পরিবারে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের পরিবারে মহিলারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সংসারধর্ম পালন করার সময় তাঁরা মূলত পরিবারের সর্বতোমঙ্গল কামনা করেন। আবার, আমরা জানি যে পরিবার হলো রাষ্ট্রের একটি একক। হিন্দু পরিবার যখন স্বকীয়তার সঙ্গে প্রকট হয়, তখন রাষ্ট্রের গৌরবময় স্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং, পরিবারের সামূহিক বিকাশ অপরিহার্য্য। যে কোনো দেশের পরিচিতি, সেই দেশের সমাজ, সামাজিক ব্যবহার, কাজকর্ম এবং সেখানকার পরিবারগুলির মাধ্যমে হয়। বাস্তুশাস্ত্র মতে বাড়ি কেবলমাত্র ইট-বালি-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটি কাঠামো মাত্র নয় বরং বাড়ির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেখানে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের মানসিকতা। সমাজের একটি একক হলো পরিবার। যেখানে ব্যক্তি নয়, পরিবারের গুরুত্ব সর্বোচ্চ স্থানে থাকে। সেজন্য হিন্দুদের পরম্পরায় আছে শিব-পার্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম।

চিরন্তনকাল থেকেই আমাদের সমাজে বাড়িতে কিছু রীতিনীতি পালন করা হয়ে থাকে। সেজন্য বাড়ি বলতেই আমরা বুঝি পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা, আত্মীয়তা, সমরসতা ইত্যাদির এক অপূর্ব সমন্বয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তা, একতা, শ্রদ্ধাভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য। আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে, হিন্দু পূজা-পদ্ধতি যথারীতি পালন করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের পরিবারে ঠাকুরঘর, তুলসীমঞ্চ, পূজাপাঠ, সংস্কারীপূর্ণ জীবনযাত্রা যেভাবে নির্বাহ হয়ে থাকে, তার নেপথ্যে থাকে বাড়ির মহিলাদের কল্যাণময়ী স্পর্শ। তাঁরা তাঁদের পারম্পরিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে বাড়ির সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন— আমাদের কর্তব্য, সিদ্ধান্ত ও আদর্শ। বাড়ির মহিলাদের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হন বাকি সবাই। সেই কারণে গৃহকর্ত্রীরা হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন না। তাঁদের দ্বারা গৃহীত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত হয় পরিবার, সমাজ তথা দেশের মঙ্গলার্থে। ব্যক্তিরূপে নয়, পরিবার রূপে, সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে, সর্বোপরি রাষ্ট্রহিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ভারতীয় মহিলা শিক্ষিত হয়েও পরম্পরা, সংস্কার বজায় রেখেছেন, সেজন্য আজ আমরা স্বগরিমায় উচ্ছ্বসিত। ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরা সর্ব কল্যাণার্থে নিয়োজিত করেন নিজেদের।

পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্দাম প্রলোভনের মধ্যে নিজ সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য বাড়ির মহিলাদের ভূমিকা যেমন থাকে, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যরা চেষ্টা করেন জন্মতিথি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি পারস্পরিক ভাবেই পালন করতে। আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি, যে পাশ্চাত্য সভ্যতা আকর্ষণীয়ভাবে নানা বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, তার আয়ু মাত্র কয়েকশো বছর, আর আমাদের সনাতন ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পথ প্রদর্শন করে আসছে। সুতরাং বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত এই সংস্কারের প্রতিই আমরা যেন অনুগত থাকি।

বিবাহের রীতিনীতিও পারম্পরিকভাবে পালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা চেষ্টা করব, আমাদের পরিবারে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সাহিত্য, মহাপুরুষদের জীবনী যেন নিয়মিত পাঠ এবং আলোচ্য বিষয় রূপে পরিগণিত হয়। পারিবারিক সম্বোধনে ভারতীয়তা বজায় রাখা কাম্য। বাড়ির বাইরে ফলকে সদস্যদের নাম যেন মাতৃভাষায় লেখা থাকে আমরা মহিলারা নিজেদের প্রয়োজনমতো খাদ্যদ্রব্য, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করব। সেখানে অপচয়ের কোনো স্থান থাকবে না। আমাদের জীবনযাত্রা যেন অনুসরণযোগ্য হয়। অপ্রয়োজনীয়, অসংযমী বিলাস-ব্যসনকে ভারতীয় মহিলারা কখনই প্রশ্রয় দেননি।

আবার আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে পূজা-পার্বণে পরিবারের পক্ষ থেকে গরিব, অসহায় মানুষকে যথাযোগ্য সাহায্য ও সম্মান জানান তাঁরাই। আত্মীয়স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক মূলত তাঁরাই বজায় রাখেন। আমাদের বেশিরভাগ পরিবার এইভাবে চলতে থাকে।

সব সময় হয়তো আমরা নতুন করে বা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করি না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরা বজায় রেখেই চলছে। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব আমাদের বাড়ির মহিলাদের প্রতি তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়—

রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তি সমাজস্য চ ধরিণী।
ভারতে সংস্কৃতে নারী মাতা নারায়ণী সদা।। □

অথ চিনি কথা

ডাঃ বলরাম পাল

আমরা সাধারণত চিনিকে তার মিষ্টতার জন্যই চিনে থাকি। কিন্তু এই মিষ্টতাই কি সব? আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চিনি একটি নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান। বিশেষ করে বাঙ্গালিদের তো বটেই। সকালে চা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত খাদ্যে আমরা চিনি ব্যবহার করে থাকি। রাত্রে ভোজনের পর মিষ্টি সেবন যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গেলে আমরা মিষ্টি হাতে করে নিয়ে যাই পক্ষান্তরে যাদের বাড়িতে গেলাম তারাও মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। অনুষ্ঠান বাড়ির খাওয়াদাওয়া শেষে মিষ্টি পরিবেশন করা অপরিহার্য, অর্থাৎ চিনি ব্যবহার অপরিহার্য।

আমাদের দেশে সাধারণ ইক্ষু রস থেকে চিনি উৎপন্ন হয়। ইক্ষু বা আখের রস থেকে প্রথমে গুড় এবং পরে বিভিন্ন পরিশোধনের মাধ্যমে সাদা দানাদার চিনি উৎপন্ন হয়। চিনি উৎপন্ন হওয়ার পর তার মধ্যে আখের রসের আর কোনোরূপ মৌলিক উপাদান অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ চিনি গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। আমরা চিনি হিসেবে যে সাদা জিনিসটি চিনি তা হলো সুক্রোজ। কার্বনের ১২টি পরমাণু, ২২টি হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং অক্সিজেনের ১১টি পরমাণু $(C_{12}H_{22}O_{11})$ দ্বারা গঠিত হয় একটি সুক্রোজ অণু।

চিনির মিষ্টতা যতই আমাদের প্রলুব্ধ করুক না কেন এর থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আমাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা যেন শুধুমাত্র রক্তে উচ্চ শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলেই চিনি খেতে বারণ, কিন্তু চিনি আমাদের শরীরে নানাভাবে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেজন্য চিনিকে 'সাদা বিষ' নামেও অভিহিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ভারতে বিক্রি হওয়া ছোটোদের জন্য খাদ্য এবং চকলেটগুলিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চ মাত্রায় শর্করার পরিমাণ রয়েছে। অতিরিক্ত চিনি সেবনের ফলে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে গুরুতর নানা রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

- অতিরিক্ত চিনি সেবনের ফলে স্থূলতা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ চিনি লিভারে গিয়ে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়, তখন তাকে ফ্যাটি লিভার বলে অভিহিত করা হয়। এমন একটি প্রচলিত ধারণা আছে যেন শুধুমাত্র মদ্যপান করলেই ফ্যাটি লিভার হতে পারে কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে মোটা নাদুস নুদুস থলথলে চেহারার শিশুদের মধ্যে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে যাকে ননঅ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার বলা হয়। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে সেরকম কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না তাই আমরা এই ব্যাপারটিকে অবহেলা করি। শিশুদের মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য, পেটব্যথা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা দিলে আমরা চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হই।
- ফ্যাটি লিভার আক্রান্তদের মধ্যে নানা রকম জটিল রোগ যেমন ফাইব্রোসিস, সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে চিনি খাওয়া কমানো ফ্যাটি লিভার কমানোর সেরা উপায়।
- অতিরিক্ত চিনি সেবনে কেবলমাত্র স্থূলতা বৃদ্ধি পায় শুধু নয়, এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়াতে পারে।
- চিনি বিশেষ করে চিনিযুক্ত পানীয় ক্যানসারের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
- চিনি এবং প্রসেস্‌ড খাবার থেকে হতাশা বা ডিপ্রেশনের মতো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
- খুব বেশি চিনি খাওয়ার ফলে যেমন পিম্পল বা ব্রণর উৎপাত বাড়ে, তেমনি এর প্রভাবে অল্প বয়সে চামড়ায় বার্ধক্যের ছাপ আসতে পারে।
- চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় দাঁতেরও ক্ষতি করতে পারে।

আমরা ভাত, ডাল, রুটি যা কিছু খাই না কেন তা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়, যা এক ধরনের চিনি। হজম, রক্ত সঞ্চালন, এমনকী শ্বাস-প্রশ্বাস-সহ দৈনন্দিন সমস্ত ছোটো বড়ো কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের গ্লুকোজের প্রয়োজন হয় এবং আমরা নিয়মিত যে খাবার খাই তা থেকেই পেয়ে থাকি। তবে কি চিনি খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ? সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ২৫ গ্রাম বা ৬ চা চামচের বেশি চিনি গ্রহণ স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

পরিশেষে আবারও বলি চিনি বা এই সাদা বিষ থেকে সাবধান। □

অযোধ্যায় রামলালার স্বপ্নময় মন্দিরে

দুর্গাপদ ঘোষ

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং আধুনিককালের নগর শৈলীর 'মারু-গুজারা' ভাস্কর্যে নির্মিত বৃহত্তর মন্দির এবং তার গর্ভগৃহে বিরাজমান বিগ্রহ দর্শন করার জন্য মন আকুল হবে এটা যে কারও ক্ষেত্রেই খুব স্বাভাবিক। আর সেই মন্দিরে বিরাজমান বিগ্রহ যদি হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্রের তাহলে তো কথাই নেই। কতক্ষণে সেই বিগ্রহের কাছে পৌঁছব, কতক্ষণে দেখতে পাবো অতুলনীয় ভাস্কর্য খচিত সেই মন্দির, সেজন্য মন উচাটন হবে এ আর নতুন কথা কী! সেই সঙ্গে যুগ যুগ ধরে যে জনপদের আকর্ষণ নিশির ডাকের মতো মানুষকে সম্মোহিত করে আসছে সেই পবিত্র অযোধ্যার মাটি স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা তো রয়েইছে। অযোধ্যা, যাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না, সেই নগরীর এক অসাধারণ বর্ণনা রেখে গেছেন মহর্ষি বাল্মীকি। রামায়ণের আদিপর্বে স্বর্গলোকের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন, 'অষ্টচক্র নবদ্বারা দেবানুপারাযোধ্যা...'।

সুতরাং সময় ও সুযোগ বুঝে শ্রীরাম এবং তাঁর দেবপুরীতুল্য জন্মভূমি দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়া গেল। কাশীধাম থেকে, সপরিবারে। দূরত্ব তেমন একটা বেশি নয়। ২১৮ কিলোমিটারের মতো। মাঝপথে চা-পান এবং বিশ্রামের সময় ধরে ঘণ্টা পাঁচেক। কিন্তু মাত্র সেই পাঁচ ঘণ্টা যেন ফুরোতেই চায় না। মন প্রাণ সারাক্ষণই প্রশ্ন করে যেতে থাকল, 'কোথায় অযোধ্যা, কোথা সেই রাম!' যাঁর নিজগৃহে পুনরায় ও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হতে নয় নয় করে ৪৯৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যাঁর মতো রাজর্ষি ঈশ্বরকে তাঁর গর্ভগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রাণপাতকারী সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁর ভক্তরা। সাধুসন্ত থেকে শুরু করে তিন লক্ষেরও বেশি হিন্দু নিজেদের রক্তস্রোত বইয়ে প্রাণ বলি দিয়েছেন। এহেন পুরুষোত্তমের বিগ্রহ, তাঁর জন্মভূমি দর্শন করার আকুতি দ্রুত এত প্রবল আকার নিল! যে মুহূর্তে জানতে পারলাম নবনির্মিত 'রামপথ'-এ এসে গেছি তখন আর মনকে যেন বেঁধে রাখতে পারি না

এমন অবস্থা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছলাম চূড়ামণি চকে। সেখান থেকে রামজন্মভূমি মন্দির বড়োজোর দু' আড়াই কিলোমিটার। মনে হতে লাগল আর বাহনটাহনের দরকার নেই, ছুটে চলে যাই। পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করতে হবে, সবরকম নিয়ম কানুন মেনে বেরতে হবে, সে তো আরও অন্তত ১৫-২০ মিনিটের ব্যাপার!

পার্কিং লট থেকে বেরবো-বেরবো করছি, হঠাৎ নজরে পড়ল পর পর দু'খানা ব্যাটারি কার্ট ঢুকল। এই বাহনগুলো রামমন্দিরে যাবার প্রবেশ পথের একেবারে সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। এগুলোতে ১৩-১৪ জন যাত্রী খুব স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যাত্রী বলতে আমরা মাত্র তিনজন। সুতরাং তখনই তাতে উঠে পড়ার বাসনা ত্যাগ করতে হলো। পার্কিং লটের গেটের বাইরে আসতে না আসতেই সামনের রাস্তার ওপর অটো, টোটো, আরও অনেক কার্ট এমনকী কয়েক পা দূর দিয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সড়ক পরিবহণ নিগমের এসি বাস চলাচল করতে দেখলাম। যাতেই উঠুন ভাড়া মাথাপিছু ২০ টাকা (২০২৪ সাল)। সবই বেশ ফাঁকা ফাঁকা। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন বিশেষ কোনো পরব ছিল না। আসেননি বিশেষ কোনো বিশিষ্ট জনও, তাই মারাত্মক ভিড় হয়নি। সেদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনার্থী সমাগম হয়েছিল দেড় লাখের মতো। রাম নবমী কিংবা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তসংখ্যা ৫ লক্ষও ছাড়িয়ে যায়।

বারাণসীর দিক দিয়ে সড়কপথে গেলে যে চূড়ামণি চক হয়ে রামজন্মস্থানের দিকে প্রবেশ-প্রস্থান করতে হয় তাকেই বর্তমান অযোধ্যাপুরীর একদিকের প্রবেশ দ্বার বলা যেতে পারে। এই চক বা চৌরাস্তার সংযোগস্থলে নির্মাণ করা হয়েছে ব্রোঞ্জে তৈরি এবং বেশ বড়ো আকারের টায়ারের মতো একটা দর্শনীয় বস্তু। তার সারা গায়ে দেবনাগরী লিপিতে রামনাম খোদাই করা। সীতাদেবী নাকি এই ধরনের আল্টা বা বিড়া দিয়ে চুল বাঁধতেন, কেশ পরিচর্যা করতেন, চুলের চূড়া বাঁধতেন। সুতরাং চূড়ামণি চকের এই বিড়া কেবলমাত্র একটা দর্শনীয় বস্তুই নয়। এর সঙ্গে সবার ভক্তিরসও জড়িয়ে আছে। অন্যদিকে ৩২৭নং জাতীয় সড়ক দিয়ে লতা মঙ্গেশকর চক হয়েও অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করা যায়। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

রামপথের ওপর থেকে ঠিক কোথায় এবং কোনদিকে মন্দির পরিসরে প্রবেশ করতে হবে তা কাউকে বলে দিতে হবে না। টেনে নিয়ে যাবে মধুর সুগন্ধের মিষ্টি সৌরভ। বাহন থেকে নামামাত্রই প্রাণমন ভরে গেল ম-ম করতে থাকা সেই সৌরভে। মন্দিরের তোরণ পর্যন্ত এই সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে মঙ্গলদীপ ধূপের ধোঁয়া। ধূপকাঠি তো নয় যেন এক একটা ছোটোখাটো লাঠি। প্রায় ৪ ফুটের মতো লম্বা এবং লাঠির মতো মোটা মোটা। প্রতিদিন সকাল থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষ কিছুটা দূর অন্তর জ্বালিয়ে রাখেন। এগুলো শ্রদ্ধার দান হিসেবে দিয়ে থাকেন এর প্রস্তুতকারকরা। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে প্রতিদিন নিয়মিত এই ধূপকাঠির সুগন্ধ ছড়াচ্ছে গোটা মন্দির পরিসর জুড়ে।

রামপথ থেকে মন্দির পরিসরে প্রবেশের মুখেই বাঁ দিকে রয়েছে সবার জন্য আধুনিক বন্দোবস্তের প্রশস্ত প্রতীক্ষালয় তথা বিশ্রামাগার। সেখান থেকে মাত্র কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সুগ্রীব মন্দির। আর ঠিক তার বিপরীতে অর্থাৎ ডানদিকে ৩০০ মিটার মতো দূরে রয়েছে বিখ্যাত হনুমানগড়ি মন্দির ও আশ্রম। প্রধান সড়ক দিয়ে যাওয়া ছাড়াও সুগ্রীব মন্দিরের উলটোদিকের গলিপথে দিব্যি পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যায়। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির-বিগ্রহ দর্শনকারীরা কেউ রামভক্ত হনুমানের এই মন্দির দর্শন না করে ফেরেন না। রামমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করার সময়ও ১৬ ফুট চওড়া সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে উঠে বস্তুত শ্রীরামচন্দ্রের অনেক সংকটমোচনকারী হনুমানের মূর্তি পার হয়ে তবেই যেতে পারা যায়। তার আগে প্রথম ধাপে দু'পাশে শুঁড় উঁচিয়ে স্বাগত ভঙ্গিতে রয়েছে দুটি হাতির মূর্তি। তারপর তেজস্বিতা তথা শৌর্যবীর্যের প্রতীক স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা— দুই সিংহ। তার ওপরের ধাপে বিরাজমান রয়েছে গোলোকাধিপতি বিষ্ণুর বাহন দুটি গরুড়মূর্তি। এঁরাই যেন সবাই রামলালার গর্ভমন্দিরের দ্বারপাল।

ভক্ত সমাবেশ যেদিন যেমনই হোক না কেন, নিখুঁত ও মসৃণ ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। অনেক আগে থেকে দুপাশে রেলিং ঘেরা আধ ডজনের মতো লেন দিয়ে অতি সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। রামপথ থেকে গর্ভমন্দিরের সিঁড়ি অবধি ৩০০ মিটার মতো পথের প্রায় সবটাই সিঁড়িহীন ঢালু ধাপ (পেডেস্টেরিয়ান)। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নারীপুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। তোরণদ্বার পেরিয়ে শুধু গর্ভমন্দিরে ওঠার জন্য কিছু সিঁড়ি ভাঙতে হয়। তবে ৭৫ বছর বয়সি এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ও অসুস্থদের এক পাশ দিয়ে এবং কোনো সিঁড়ি না ভেঙেই বিগ্রহ দর্শনে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। তাতে বসিয়ে মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিয়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য লোকও আছে। এজন্য কোনো অর্থও লাগে না। কেউ খুশি হয়ে কিছু বকশিস দিলে অন্য কথা। প্রয়োজনে আগে থেকে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য রেজিস্টার্ড তথা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের থেকে সার্টিফিকেট এবং বয়সের প্রমাণপত্র তথা আধার কার্ড জরুরি। মন্দিরে যাবার জন্য রেলিং ঘেরা লেনের মধ্যে ঢোকার আগে নির্দিষ্ট কাউন্টারে মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ধাতুনির্মিত কোনো বস্তু ইত্যাদি জমা রাখতে হয়। জুতো-চপ্পল জমা রাখার জন্য অনেকগুলো কাউন্টার আছে। অতি নম্র ও অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহারে কর্তব্যরত পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা দারুণভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। সুচারুভাবে পথ প্রদর্শন করেন।

এসবের জন্য কোনো কিছুর জন্যই কাউকে ধরাধরি কিংবা টাকাপয়সা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আর একটা বিষয় হলো, রামজন্মভূমি মন্দির এবং রামলালার বিগ্রহ কেবলমাত্র দর্শনের জন্য। পূজাঅর্চনা কিংবা পূজাপচারের কোনো ব্যাপার নেই। সেটা সবটাই কর্তৃপক্ষের। আর একটা জরুরি বিষয় হলো, প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিগ্রহের ভোগারতির সময় গর্ভগৃহের ফটক বন্ধ রাখা হয়। সে সময় যাঁরা লাইনে থাকেন তাঁদের ওই দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কারও যাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা না হয়, কিংবা অন্য সময়ও কাউকে লেনগুলোর মধ্যে অপেক্ষা করতে হলে সবাই যাতে যেখানে আছেন সেখানেই একটু বসতে পারেন সেজন্য প্রত্যেকটা লেনেই এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত স্টেনলেস স্টিলের টানা লম্বা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। সেখানে বসে ধূপের সুগন্ধ উপভোগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিক থেকে সড়ক পথে ছাড়াও রেলপথ ও বিমানেও খুব সহজে শ্রীরামজন্মভূমি দর্শন করতে যাওয়া যায়। শ্রীরামমন্দির থেকে অযোধ্যা রেলস্টেশনের দূরত্ব বড়োজোর এক কিলোমিটার। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরও সামান্য দূরত্বে, মাত্র ৮ কিলোমিটার। দু' জায়গা থেকেই মন্দিরে যাবার জন্য নানাবিধ যানবাহন রয়েছে। উল্লেখিত পার্কিং লটের দূরত্বও দেড় কিলোমিটারের বেশি নয়।

অন্তত দু'তিন জায়গায় মেটাল ডিটেক্টর ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ যখন মন্দিরের সামনে এসে অবাক বিস্ময়ে

থমকে দাঁড়ালাম তখন চারিদিক থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছে জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, সীয়াবর (সীতাপতি) শ্রীরামচন্দ্র কী জয়। ভক্ত ও দর্শনার্থীদের থিকথিকে ভিড় থেকে মুহুর্মুহু আকাশে আন্দোলিত হচ্ছে যত ভক্ত তার দ্বিগুণ হাত। মন্দিরের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে ডমরু এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। ভিতরে চলছে রামলালার আরতি। দর্শনার্থীদের অগ্রগতি কিছুটা মন্থর হলেও একেবারে থমকে নেই। এগোচ্ছি আমরাও। মন যেমন আকুলি বিকুলি করছে, চোখ দুটোও অনবরত পিপাসার্ত হয়ে চাতক পাখির মতো ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, যদি একবার তাঁর দিব্যকান্তি নজরে পড়ে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে দেরি লাগল না। ২০-২৫ ফুটের মতো দূর থেকে নয়ন বিমোহন মূর্তির পূর্ণ অবয়ব দৃষ্টিগোচর হতেই সবাই আনন্দে আত্মহারা। নিমেষে দু'গাল বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়তে লাগল বহু প্রতীক্ষার পরম রত্ন প্রাপ্তির আনন্দাশ্রু। একটু সামলে নিয়ে কিছুটা সসংকোচে আশেপাশে চেয়ে দেখি প্রায় সকলেরই আমার মতো অবস্থা। অভূতপূর্ব লাবণ্যময় রামলালার সুসজ্জিত বিগ্রহের পানে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে প্রায় সবার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে। কেউ কেউ সশব্দে একেবারে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। পিছন থেকে একটু চাপ আসছে, শ্রীরামের নামে নিরন্তর জয়ধ্বনি হচ্ছে। কিন্তু এখানে, গর্ভগৃহের মধ্যে, আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত নিকষ কালো, শতকোটি বছরের পুরনো কষ্টি পাথরের 'স্থানাঙ্ক ভঙ্গিমা'য় দণ্ডায়মান মূর্তির দিকে অপলক চোখে চেয়ে সবাই একেবারে বাক্‌রুদ্ধ। কে কোথা থেকে এসেছেন, কার ভাষা কী, চেহারা, পরিচ্ছদ কার কেমন, সব ভুলে সবাই মিলে একাত্ম। যে যার আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে সবাই মিলে 'আমরা'।

সোনার পাতে মোড়া বিশাল ৪২টা দরজার মধ্যে একটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঠেকিয়ে দু'চোখ ভরে যাঁকে দেখছি তিনি সেই রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র নন, যাঁর সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছেন, 'ধৈর্যেন হিমবানিব সমুদ্র এব গাম্ভীর্যে...'। মহীশূরের যুবক মূর্তিকার অরুণ যোগীরাজের ছেনি-হাতুড়িতে পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া একখণ্ড পাথরে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করা এই শ্রীরামচন্দ্র পাঁচবছর বয়সি, দুষ্টুমিভরা চোখমুখের চপল বালক, সূর্যবংশের রাজপুত্র— রামলালা। মন্ত্রপূত সোনার ছেনি-হাতুড়িতে খোদাই করা চোখদুটো যেন কথা বলছে। যেন এখনই ছুটে এসে কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পৌরুষপূর্ণ রাজা, ত্রাস সৃষ্টিকারী রাক্ষসরাজ রাবণ নিধনকারী রাঘব কিংবা শ্রদ্ধার মন্দিরে সিংহাসনে বিরাজমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নন, এ যেন মায়া জড়ানো ঘরের ছেলে। জীবনে অনেক মন্দিরে ভক্তিভরে অবনত মস্তকে অনেক নয়ন মনোহর দেববিগ্রহ দেখেছি কিন্তু অকপটে স্বীকার করতে তিলমাত্রও কার্পণ্য নেই যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ছবিতে, সংবাদপত্রে, টিভির পর্দায় রামলালার বিগ্রহের যে রূপ দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি আর এখন সামনাসামনি যে মূর্তি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছি তার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এ মূর্তি যে কত বেশি জীবন্ত, কত বেশি লাবণ্যমণ্ডিত, কতখানি দৃষ্টিনন্দন এবং কত বেশি নয়ন মনোহর আগে তা কল্পনাও করতে পারিনি। এরকম প্রাণ জুড়ানো, বুক ভরানো মূর্তি আগে কোথাও দেখিনি। বর্ণনার ভাষা নেই, তাই ধার করা ভাষায় বলতে হচ্ছে, 'আহা! কী হেরিলাম। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' আমাদের আগে এ মূর্তি অবলোকন করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের অনেকের কাছে শুনেছি, এখনও সবাই মিলে যারা দর্শন করলাম সবারই এক কথা, এক অনুভূতি--- এ মূর্তি একবার দেখলে জন্মজন্মান্তরেও ভোলা যায় না।

কেবল রামলালার এই বিগ্রহ নয়, তাঁর মন্দিরও। শুধু আকারে বিশাল নয়, শিল্প ভাস্কর্যেও অতুলনীয়। ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। একটু

অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দু'রকমের স্থাপত্যের তুলনা করতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, আগ্রার তাজমহল বিশ্বের দশম আশ্চর্যের অন্যতম প্রধান স্থাপত্য। বিশ্ববাসী বিপুল আগ্রহে তা দেখতে যান। অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পর্যটক আকর্ষণে সেই তাজমহলকেও অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। রামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরদিন, ২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে ২০ ডিসেম্বর, এই ১১ মাসের মধ্যে দেশি-বিদেশি মিলে তাজমহল দর্শন করেছেন মোট ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষ। আর এই একই সময়ে অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দিরে আগমন ঘটেছে মোট ১৩ কোটি লক্ষ ৮০ হাজার জনের। বিদেশিরা সাধারণত ভাস্কর্য পিপাসু। শ্রীরামভক্তদের কথা বাদ দিলেও বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও রামজন্মভূমি মন্দির তাজমহলকে ছাপিয়ে গেছে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আগ্রায় এসেছেন ২ হাজার ৯৩০ জন বিদেশি পর্যটক আর অযোধ্যায় এসেছেন ৩ হাজার ১২৭ জন। এবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে আগত পুণ্যার্থী ও পর্যটকের মধ্যে ৪৫ দিন ধরে প্রতিদিন গড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি জন রামমন্দির দর্শন করেছেন। তাঁদের সংখ্যা ধরলে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি ১৩ মাসের মধ্যে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির দর্শনকারীর সংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অযোধ্যার শ্রীরামমন্দিরের প্রতি আপামর মানুষের এত আকর্ষণ, এত বেশি আবেগের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রামলালার বিগ্রহ এবং মন্দিরের ভাস্কর্য ছাড়াও নিঃসন্দেহে বছরের পর বছর প্রতীক্ষার অবসান, যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ।

চলতি বছরের মার্চের মধ্যে রামলালার গর্ভমন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৪ একর জমিতে আরও অন্তত ৪টে বড়ো মন্দির এবং আরও কয়েকটা তুলনামূলক ভাবে ছোটো মণ্ডপ নির্মাণের কাজ যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এগিয়ে চলেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্তটা সম্পন্ন হয়ে যাবে মনে করছেন এর নির্মাণকারীরা। আপাতত যে মূল মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে তাতেই চোখ কপালে ওঠার মতো। কেবল আকারে নয়, শিল্প ভাস্কর্যের সুষমাতেও। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৩৮০ ফুট, প্রস্থ ২৫০ ফুট এবং উচ্চতা ১৬১ ফুট। গগনচুম্বী শিখরের মাথায় সোনার কলসের ওপরে পতপত করে উড়ছে স্বর্ণোজ্জ্বল গৈরিক পতাকা। জয় শ্রীরাম লেখা একটা স্তম্ভ অনেক দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। ৩টি তলা সমন্বিত গর্ভমন্দির-সহ

ফঃ ৪

সমগ্র মন্দির পরিসর নির্মাণের প্রধান স্থপতি হলেন আমেদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর চন্দ্রকান্ত সোমপুরা। সঙ্গে আছেন তাঁর দুই ভাস্কর-পুত্র নিখিল ও আশিস। সোমপুরা পরিবার এর আগে গুজরাটে সোমনাথ মন্দির-সহ সারা বিশ্বে ১০০টিরও বেশি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করেছে। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের আদলও অনেকটা সোমনাথ মন্দিরের মতো। আর এই বিশাল মন্দির যাঁরা তৈরি করছেন তারা হলেন বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা লার্সন অ্যান্ড টুবরো। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে সারা বিশ্বের নজরকাড়া এই মন্দির তৈরি করে দিতে এগিয়ে এসেছেন অন্যতম বিশ্বসেরা এই সংস্থা।

এর আগে এই শ্রীরামজন্মভূমিতে 'বাবরি মসজিদ' নামে মুসলমানদের অব্যবহৃত যে ধাঁচা ছিল এবং যার মধ্যে ১৯৪৯ সালে রামলালার বিগ্রহ প্রকটিত হবার পর পূজার্চনা হচ্ছিল, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলনকারী করসেবকদের রোষানলে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তার আগে এখানে গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যর সময়ে নির্মিত যে রামমন্দির ছিল তা দাঁড়িয়ে ছিল হিন্দুদের নানা মঙ্গলচিহ্ন খচিত ৮৪টি স্তম্ভের ওপর। ১৫২৮ সালে বহিরাক্রমণকারী বাবরের নির্দেশে সেই মন্দির ধ্বংস করে তার ওপরে তৈরি করা হয়েছিল তথাকথিত বাবরি ধাঁচা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য ১৯৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করে বর্তমানে প্রয়াত অশোক সিংঘলের নেতৃত্বে। পরিষদ তথা হিন্দু সমাজ শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণে এতটাই দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসী ছিল যে উল্লেখিত ৬ ডিসেম্বরের প্রায় ৪ বছর আগে ১৯৮৮ সালেই শ্রীসোমপুরাকে শ্রীরামমন্দির নির্মাণে নকশা তৈরির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে রাজস্থানের বনসী ও ভরতপুর থেকে উঁচু মানের বেলে পাথরের চাঁই আনিয়ে ১৯৯০ সাল থেকেই নকশা খোদাইয়ের কাজ শুরু করা হয়। উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদবের সরকার এই পাথর আনার ওপর নিষেধ জারি করেছিল। কিন্তু ঠেকাতে পারেনি। এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ কিউবিক ফুট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩৬৬টি নকশাখচিত স্তম্ভের ওপর মন্দিরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মোটা মোটা এবং অত্যন্ত মজবুত এইসব স্তম্ভের প্রত্যেকটির গায়ে রয়েছে শিব, বিষ্ণুর দশাবতার, ৬৪ যোগিনী, সরস্বতী এবং গণেশের নয়ন মনোহর মূর্তি। এক নজরে দেখেই বোঝা যায় এইসব স্তম্ভ ও কারুকার্যখচিত অন্যান্য পাথর এখনো ঠিকমতো পালিশ হয়নি। তাতেই যা দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে মনে হচ্ছে যেন কোনো মায়াবী স্বপ্নের জগতে দাঁড়িয়ে আছি। পুরোপুরি পালিশ হয়ে গেলে মনে হচ্ছে আলো ঠিকরে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। গর্ভ মন্দিরের দোতলায় রয়েছে শ্রীরাম দরবার। বিগ্রহ বিরাজমান গর্ভগৃহের মাথার ওপরের শিখর চূড়ার স্থানকে বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় এই দরবারে রয়েছে নৃত্য মণ্ডপ, রং মণ্ডপ, সভা মণ্ডপ, প্রার্থনা মণ্ডপ এবং কীর্তন মণ্ডপ। এছাড়া নির্মীয়মাণ রয়েছে সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভগবতী, শিব, অন্নপূর্ণা, গণেশ ও হনুমান মন্দির। প্রায় লাগোয়া সীতারসোই বা সীতাদেবীর রন্ধনশালার পাশে তৈরি হচ্ছে সীতাদেবীর মন্দির। ভবিষ্যতে কোনোদিন যাতে মরচে ধরতে না পারে সেজন্য কোনো মন্দিরেই কোনো লোহা কিংবা ইস্পাত ব্যবহার করা হয়নি। নকশাখচিত পাথর জোড়া দিতে ব্যবহার করা হয়েছে ১০ হাজারের মতো তামার পাত।

পাথরের ওপর খোদাই করা পাপড়ি মেলা পদ্মফুলের মাঝখানে দণ্ডায়মান বিগ্রহ। মাথায় হিরা, পান্না, চুনি খচিত ৫ কেজি নিরেট সোনার অসাধারণ সুন্দর মুকুট। কানের কুণ্ডল থেকে থেকে দু' পায়ের নূপুর পর্যন্ত রত্নখচিত সোনার ঝলমলে অলঙ্কার। আর কাঁধ থেকে অজানুলম্বিত পাথরের মালায় ভাস্কর্যখচিত বিষ্ণুর দশাবতারের ছোটো ছোটো মূর্তি। দু'পাশে শোভা পাচ্ছে বিষ্ণু, গরুড়, স্বস্তিকা, ওঁ, শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, পদ্ম, শিব এবং সূর্যের প্রতীক। কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বিত সোনার নির্মিত ধনুর্বাণ। এই 'মহাধনুষ' বা 'কোদণ্ড' নির্মাণ করা হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে। সব মিলিয়ে রামলালার বিগ্রহ এবং মন্দির যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্যে বিভূষিত। বিগ্রহের কপালে হিরা-মানিকে তৈরি যে তিলক রয়েছে প্রতি বছর শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি বা রামনবমীর দুপুরে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। তার ওপর সূর্যালোকের প্রতিফলন ঘটিয়ে 'সূর্যতিলক'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ২০২৪ সালের রামনবমী থেকে। এই সূর্যতিলকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। রামলালা অর্থাৎ আদরের বালক রামচন্দ্র 'মূলাবিরত' বা অচল মূর্তি, স্থির মূর্তি। স্থানান্তরিত হয় না। আর ১৯৪৯ সাল থেকে বাবরি ধাঁচার মধ্যে যে বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছিল অর্থাৎ 'রামলালা বিরাজমান' মূর্তিকে প্রতিপাদিত করা হচ্ছে 'উৎসব মূর্তি' হিসেবে। ৯ ইঞ্চি উচ্চতার সেই বিগ্রহেরও পূজার্চনা হচ্ছে। গর্ভগৃহের বাইরে কোনো উৎসব-পার্বণে তাঁকে আরাধ্য বিগ্রহ হিসেবে স্থাপন করা হয়ে থাকে।

পুনর্নির্মিত রামমূর্তি এবং মন্দির ছাড়াও শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যা দর্শনও একটা বড়ো প্রাপ্তি বিশেষ করে মন্দির থেকে দেড়-দু' কিলোমিটার দূরে লতা মঙ্গেশকর চকের তো তুলনা হয় না। সরযূ নদীতে নবনির্মিত নয়াঘাট থেকে ৫০০ মিটার দূরে চৌরাস্তার মোড়ে আধুনিক প্যাটার্নে বানানো এই চকে নির্মাণ করা হয়েছে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া একটি বিরাটাকার বীণা। রামভক্ত লতাজীর স্মৃতি রক্ষার্থে ব্রোঞ্জ নির্মিত নকশাকাটা এই বীণা যে কোনো পর্যটকের মন ভুলিয়ে দেবে। কেবল হনুমানগড়ির চত্বরটুকু বাদে প্রাচীন অযোধ্যাপুরীর বাহ্যিক কলেবরে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে, আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। ঝাঁ চকচকে রেস্তরাঁ, বিলাসবহুল হোটেল, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কী নেই! রাস্তাঘাট অনেক প্রশস্ত করা হয়েছে তাই নয়, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নও। আগে যাঁরা অযোধ্যাপুরীতে গেছেন, এখন গেলে প্রথমে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতে পারেন। কথায় বলে 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।' এটা আংশিক এবং কিঞ্চিৎ সত্য। বহিরঙ্গে সে অযোধ্যা হয়তো নেই, কিন্তু সে রাম যেমন ছিলেন তেমনই রয়েছেন। গোটা অযোধ্যা এখনও আগের মতোই রামময়। যেখানেই যান সবাই একটা মন্ত্রেই স্বাগত জানাবে, একটা ধ্বনিতেই বুঝিয়ে দেবে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় এসেছেন—'জয় শ্রীরাম'। □

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের শান্তিনিকেতনে আলোচনাসভা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতী শৈক্ষিক সঙ্ঘের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল,পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় এবং মধ্যবঙ্গের বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপালজীর প্রেরণায় সমগ্র দেশের ভক্তিসাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন এবং তার হিন্দি অনুবাদের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক রামেশ্বর মিশ্র এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রকল্পের কাজ করে চলেছেন। প্রায় দু'শো জন মুসলমান কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ২০০০টি পদ সংগৃহীত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৫০০টি পদের হিন্দি অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ড. কৃষ্ণগোপাল তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, এই ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে সারা দেশে সমাজ ও সাহিত্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। তাই সমগ্র দেশের ভক্তিসাহিত্যের সংকলন এবং হিন্দি অনুবাদ একটি অবশ্য কর্তব্য।

আলোচনাসভায় বহু অধ্যাপক, ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত ভবনের অধ্যাপক ড. মানস ভুল। স্বাগত ভাষণ দান করেন অধ্যাপক রামেশ্বর মিশ্র। সমাপ্তি সংগীত হিসেবে লালন শাহের গান পরিবেশিত হয়। শেষ লগ্নে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শৈক্ষিক সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ সুকুমার পাল।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে মেদিনীপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী, মেদিনীপুর জেলার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে গণপতি বসু স্মৃতি উদ্যান প্রাঙ্গণে গত ১৪ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত দোল উৎসব এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী, মেদিনীপুর জেলার সভাপতি পূর্ণেন্দু মাঝি, মুখ্য উপদেষ্টা ড. জগমোহন আচার্য, সংস্থাপক সদস্য আশিস কর্মকার ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য বলাই বসু। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর শ্রীচরণে আবির দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক তিমির কুমার বর্মন এবং কোষাধ্যক্ষ শান্তনু হালদার। সংস্কার ভারতীর ভাব সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক তিমির কুমার বর্মন। সংগীত শিল্পী আশিস কর্মকার, ডাঃ সৌমেন্দ্র হোতা, পল্টু চক্রবর্তী, বলাই বসু, বলাই দত্ত, মিতা ঘোষ, ইন্দ্রাণী কর্মকার, আশা ভকত, অনন্যা বিদ এবং অন্যান্য শিল্পীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। গানের ছন্দে ও নাচের তালে তালে শিল্পীরা পরস্পরকে আবীর দিয়ে দোল উৎসবের প্রীতি বন্ধনে উৎসব প্রাঙ্গণটিকে আনন্দমুখর করে তোলেন। অনুষ্ঠানে তবলা ও নাল বাজিয়ে সহযোগিতা করেন আশিস সিংহ ও নয়ন চক্রবর্তী। সংস্কার ভারতীর বোধচিহ্ন রথচক্রের ৮টি কলাকে নিয়ে একটি গীতি আলেখ্য উপস্থাপন করেন সদস্য ডাঃ সৌমেন্দ্র হোতা।

সংস্থার সম্পাদক তিমির কুমার বর্মনের কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সারদা শিশুতীর্থ সংস্থাপক শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

সারদা শিশুতীর্থ, সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১২ ও ১৩ মার্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় 'সারদা শিশুতীর্থ / শিশুমন্দির সংস্থাপক শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান'। যাদের সার্বিক সমর্পণ ও অবদানের মাধ্যমে এই শিশুতীর্থ শিশুমন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল, তাঁদের অনেকেই আজ স্বর্গগত। যাঁরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ষাটোর্ধ্ব বা তৎসন্নিকটস্থ বয়সের ব্যক্তিত্ব। স্থানীয়রা ছাড়া উচ্চরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৪টি জেলা থেকে ৩৮

জন শিক্ষাব্রতী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং ১৯৭৫ সালে শিলিগুড়িতে শিশুতীর্থ স্থাপনের প্রথম সংগঠক ব্যক্তিত্ব লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা।

১২ মার্চ সন্ধ্যায় এতদ্‌অঞ্চলের শিশুতীর্থ, বিদ্যামন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের উপস্থিতিতে আগত শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশে স্বাগত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শিশুতীর্থ / বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার্থীরা নৃত্য, গীত, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে সকলকে স্বাগত জানায়।

১৩ মার্চ মূল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাহুডাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিনয়ানন্দজী মহারাজ। স্বামী নরেশানন্দজী মহারাজ ৫০ বছরের সন্ন্যাস জীবনের অনুভূতিতে দেশভাগের নানা যন্ত্রণার কথা, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে অন্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভাব জাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা ১৯৭৫ সালে শিশুতীর্থ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটের বিবরণ সকলের সামনে তুলে ধরেন। অদ্বৈতচরণ দত্ত বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাভারতী প্রদত্ত শিক্ষার তাৎপর্য ও সামাজিক সমানুভূতি, সমভাবের কথা উল্লেখ করে সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশুতীর্থের সম্পাদক প্রদীপ সাহা, সভাপতি বিমলকৃষ্ণ দাস ও প্রধানাচার্য অনিরুদ্ধ দাস-সহ সমিতির অন্যান্য সদস্য, অভিভাবক-অভিভাবিকা, প্রাক্তন বিদ্যার্থী ও আচার্য- আচার্যারা। বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি পবনকুমার নকীপুরিয়া অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

জ্যোতির্ময় শ্রীরামনবমী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সত্যস্বরূপ রাম

রাম। একটি শব্দ। একটি নাম। তবে তা বদ্ধ নয় নিত্যদিনের সাধারণ অর্থে। রাম শব্দব্রহ্ম। রাম নাম ব্রহ্ম। ব্যাপ্ত চরাচরে। রাম চিরসত্য। রাম জ্ঞান-আলো-শক্তি-প্রেম ও সম্প্রীতির এক শক্তিশালী মহাজাগতিক মিলনের সজীব প্রতীক। আধ্যাত্মিকতা আর বৈজ্ঞানিক সত্যের অপরূপ মেলবন্ধন রাম।

রামের অর্থ আলো। এমনটাই বলেন শাস্ত্রজ্ঞ মানুষজন। রশ্মি ও তেজের মূল রয়েছে রাম শব্দের গভীরে। বলা হয়, রাম শব্দের ‘র’ বর্ণটির হলো মায়ের রূপ— সযত্ন-সস্নেহ লালনপালন, প্রেম ও অস্তিত্বের বস্তুগত প্রকাশের মাত্রা।

শঙ্করাচার্যের ‘আনন্দলহরী’ অনুযায়ী, যিনি ছ’টি আধারচক্রে অবস্থান করে নিত্যা— আদ্যাশক্তি মহামায়াকে দর্শন করেছেন, যিনি ওই শক্তি থেকে নির্গত ৩৬০টি শক্তির উপর কর্তৃত্ব করেছেন— তিনিই রাম।

আভিধানিক অর্থে রাম— চারু, মনোজ্ঞ, রমণস্থান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকথায়, ‘রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্বুধাঃ। রময়া রমণস্থানং রামবিদো বিদুর।’ —যিনি রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীর সঙ্গে রমণ করেন— পণ্ডিতরা তাঁকেই রাম বলেন। সংবৎসর স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর যিনি রমণ স্থান তাঁকেই রাম বলে অভিহিত করেন বিধুজনরা। তাঁদের আরও অভিমত, ‘রা’ শব্দ বিশ্ববাচী এবং ‘ম’-ঈশ্বরবোধক, অর্থাৎ যিনি বিশ্বমণ্ডলের ঈশ্বর, তিনিই অভিরাম— রাম।

নাম-মাহাত্ম্য

বটফল। লাল টুকটুকে। আকারে গোটাকয় মটরদানার মতো। তার মধ্যে রয়েছে বীজ অগমন। প্রায় মিহি চিনির দানার মতোই। দেখে কে বলবে, ওরই মধ্যে রয়েছে সুবিশাল এক মহীরুহের প্রাণ। রাম নামও ওই রকম। মাত্র তিন বর্ণের একটি নাম। অথচ তা ব্রহ্মস্বরূপ। চেতন অথবা জড়— বিশ্বভুবন অথবা লোকলোকান্তর সবকিছুই বিলীন ওই রাম-নামে।

রাম নয়নাভিরাম। মনের আনন্দ, বচনে মধুর, শ্রবণে সুন্দর— সর্বদাই অভিরাম— নিরন্তর রমণীয় নাম—রাম। শ্রীরামরহস্য উপনিষদের অভিব্যক্তি, —রামই পরব্রহ্ম। যোগীরা নিত্য রমণ করেন ওই নামে, শরণাগতদেরও করান রমণ। রাম নির্গুণ সচ্চিদানন্দ, আবার তিনি সগুণও।

মহাদাতা তিনি। রামপূর্বতাপনীয় উপনিষদের বচন, শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রের দ্বারা ধর্মমার্গ, নামে জ্ঞানমার্গ, ধ্যানে বৈরাগ্য এবং পূজায় করেন ঐশ্বর্য প্রদান। পরব্রহ্ম তিনি এই ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন এই জগৎ সংসারে।

রামোত্তরতাপিনীয় উপনিষদের কথা, রামমন্ত্রে সাধনরত মহেশ্বরকে ভগবান প্রসন্ন মনে বলেন, রাম মন্ত্রে ভক্তিভরা চিত্তে যে তাঁর পূজা করবে তাকে ব্রহ্মহত্যা-সহ সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত করবেন তিনি। শ্রীমুক্তিক উপনিষদেও রয়েছে এই আশ্বাসের প্রতিধ্বনি,— দুরাচারীও রাম ভজনা করলে লাভ করবে সালোক্য মুক্তি— তাকে যেতে হয় না আর অন্যলোকে।

বৃদ্ধ মনুস্মৃতি মতে একমাত্র পরম মন্ত্র ‘শ্রীরাম’। কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে, অবিনশ্বর রাম নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া যায় পবিত্র। একইভাবে ব্রহ্মপুরাণে আশ্বাস, রামনাম উচ্চারণমাত্র দগ্ধ হয় সবরকম পাপ। বিষ্ণু পুরাণের কথা, বিষ্ণুর এক একটি নাম সমস্ত বেদের চেয়েও বেশি ফল দেয়। শিব পুরাণের ঘোষণা— শ্রীরামনাম অখিল জগতের ঈশ্বর— তিনিই আদিদেব। স্কন্দ পুরাণের উক্তি— শ্রীরামনাম শক্তি থেকেই সমুদ্ভব সমস্ত অবতার। এই ভাবে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই রয়েছে রামনাম মাহাত্ম্য কথা।

রামরাজত্ব

ভারতাত্মা রাম। ভারত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রাম। তিনি অবতার পুরুষ। আবার তিনি ভগবান। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ও বিভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁরই মধ্যে। তাঁর জীবন, তাঁর কর্মসাধনা কোনো দূরের বস্তু নয়। তিনি আরাধ্য কিন্তু কেবল পূজার আসনেই তাঁর স্থান নয়। তিনি রয়েছেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে।

পুত্র হিসেবে তিনি সত্যের প্রতিমূর্তি। সব জেনেও পিতার মহিমাকে মান্যতা দিয়েছেন তিনি সব কিছুর উপরে। এক্ষেত্রে নিঃশর্ত তাঁর পিতৃভক্তি। বিচারের কূট নীতিতে বিশ্লেষণ নয়, স্বাভাবিক বোধ ও বুদ্ধিতে পিতার মর্যাদা রক্ষায় বিসর্জন দিয়েছেন সবকিছুকে। এক্ষেত্রে আত্মপ্রীতি অথবা আত্মসুখ নয়, পিতার প্রতি স্বভাব আনুগত্যে সংসার তথা জগতের স্থিতিশক্তিকে বজায় রেখে সর্বজনের সুখ-শান্তিকে সুনিশ্চিত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা না ভেবে সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি গ্রহণ

করেছিলেন বনবাস দণ্ডকে ব্রত হিসেবে। এখানেই তাঁর বিচারবোধের বৈশিষ্ট্য।

তিনি যদি পিতৃসত্য রক্ষায় বনবাসে না যেতেন তাহলে দেখা দিত এক ধরনের পারিবারিক দ্রোহ। তাতে কেবল আত্মপরিজনরাই বিপন্ন হতেন না, সেই সঙ্গে রাজ্য বা জনজীবনও হতো ধ্বস্ত। সামগ্রিক সেই অকল্যাণ রোধেই নিজের সাময়িক সুখকে দিয়েছিলেন তিনি বিসর্জন। সেই সঙ্গে রাজ সিংহাসনে বসে নিত্যদহন জ্বালায় নিজেকে দগ্ধ না করে তিনি আত্মার শান্তি এবং শম রক্ষাকেই দিয়েছেন গুরুত্ব।

প্রসঙ্গত, এই বোধকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই জয়ী হয়ে সিংহাসনে বসেও শান্তি পাননি পাণ্ডবরা। সেই মানসিক অশান্তিই বাধ্য করেছিল তাঁদের মহাপ্রস্থান যাত্রায়।

বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই শ্রীরাম এড়াতে পেয়েছিলেন সম্ভাব্য এক ভ্রাতৃসংঘাত। সিংহাসনে না বসে তিনি কেবল ভাইদের নয়— কাছের-দূরের সকলের হৃদয় সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। কেবল সেদিনের নয়— চিরকালের হৃদয়েশ্বর হয়ে তিনি আজ একটি আদর্শ।

স্বামী হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্তি। অবশ্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা অথবা সীতাবর্জন নিয়ে বিরূপ কিছু প্রশ্ন সবসময়ই সঙ্গিন উঁচিয়েই থাকে। কিন্তু এক্ষত্রেও প্রচলিত সমাজনীতির প্রতি আনুগত্য, সীতার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস এবং অতি সাধারণ প্রজার মতামতকে গুরুত্ব দিতেই এ জাতীয় পথ তিনি নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও নিজে দগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সমাজ বা রাজধর্ম থেকে বিচ্যুতি হননি। এবং না হওয়ার কারণেই নানা বিরূপতার তীক্ষ্ণ শর নিক্ষিপ্ত হয় তাঁর দিকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একান্তই অসহায়। পরিস্থিতিই বাধ্য করেছিল তাঁকে অমন সিদ্ধান্ত নিতে।

রাজা হিসেবে রাম ছিলেন সর্বকালের এক আদর্শ রাজা। তাঁর রাজ্যশাসনের মূল নীতি ছিল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ধর্ম নির্দেশিত পথে নিজের কর্তব্য পালন। আইন বা শাস্ত্রনির্দেশিত বিধান মেনে ন্যায় বিচার ও সমতার দৃষ্টিতে প্রজা পালন ছিল তাঁর আচরণীয় কর্ম। লক্ষ্য ছিল রাজ্যের সর্বত্র শান্তির সুপ্রতিষ্ঠা। তারই জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন আর্থিক দিক থেকে সুসমৃদ্ধ একটি রাজ্য। সম্প্রতির আলোকে ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ, সর্বত্র ধর্মের অনুশাসন সংস্থাপন এবং পরিবেশ সুসংহত রেখে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি ছিল তাঁর রাজ্য শাসনের বৈশিষ্ট্য। রাজা হয়ে প্রজাদের মতামতকে সর্বশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাই নিজের অপ্রীতি ও অপযশের কথা না ভেবেই সীতাকে বনবাসে পাঠান। বধ করেন অব্রাহ্মণ শম্বুককে। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কথা ভেবেই নিয়েছিলেন এসব সিদ্ধান্ত। প্রজারাও জানতো তা। তাই তাদের সুখে-দুঃখে সমব্যথী রাজা রামের শাসন ছিল স্বর্গসুখের সমান। যে কোনো সুশাসনের নাম আজও তাই রামরাজত্ব।

রাম রাজ্যের যে গৌরবগাথা ঘোষিত হয়, সেই রাজত্বকাল ঠিক কীরকম ছিল তা জানতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে বাল্মীকি রচিত রামায়ণে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রামের রাজত্বকালে অযোধ্যা তথা কোশল রাজ্যের অবস্থার কথা। আদি পর্ব বা বালকাণ্ডের প্রথম সর্গে রয়েছে রাম রাজত্বের বর্ণনা।

সেই বর্ণনা অনুযায়ী, রামের সুশাসনে প্রজারা ধর্মপথে থেকে সন্তুষ্ট এবং সমৃদ্ধ হলো। রোগমুক্ত হওয়ায় তারা হলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সুফসল হতে থাকায় প্রজাদের আর দুর্ভিক্ষের ভয় ছিল না। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এমন ছিল যে নাগরিকদের আর পুত্রের মৃত্যুশোক পেতে হতো না। অর্থাৎ শিশুমৃত্যু দূর হয়েছিল সে সময়। রমণীরা পতিপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিলেন তাঁরা।

রামের সুশাসনের কারণেই কেউ আর অন্যের ঘরে আগুন দিতে সাহস পেত না। বন্যা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় প্লাবনে ভেসে যাওয়ার ভয়ও দূর হয়। ওই সময় দূর হয়েছিল জ্বর ইত্যাদি রোগ, অনাহারে মৃত্যুর ভয়। চোরেরাও তখন চুরি করার সাহস পেত না। রাজ্যের নগর ও জনপদে সকলেই ছিলেন সত্যযুগের মতোই ধনবান।

শ্রীরামচন্দ্র নিজে প্রচুর পরিমাণ সোনা দান করেন। করেন একশোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ। সেইসঙ্গে সকলকেই তুষ্ট করেন দানধ্যানে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল সম্প্রদায়ের মানুষই নিজের নিজের বৃত্তিতে যুক্ত থেকে সুখে দিন কাটাতো। ফলে কারও মনে অসন্তোষ ছিল না। অন্যদিকে রামচন্দ্রর বলবীর্যের কারণে সকলেই ছিলেন তাঁর অনুগত। ফলে সে সময় কোনোদিক থেকেই প্রজাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। সকলেই সুখ ও শান্তির মধ্যেই জীবনযাপন করত।

মধুমাসে তাঁর আবির্ভাব

তখন মধুমাস। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া।' প্রকৃতির চারিদিকে তখন ফুলে ফুলে রঙের খেলা। বসন্তসখা কোকিলের কুহুতানে পুলকিত সকল হৃদয়। এমনই এক বাসন্তীবেলায় কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা যেন বড়ো বেশি করে সেজে উঠল। রাজা প্রজা সকলেরই দিনটা যে বড়ো আনন্দের।

সে এক আত্মহারা আনন্দ। ভোরের আকাশ রাঙা হয়ে উঠার বহু আগে থেকেই সেদিন ঘুম ভেঙেছে মধুঘোষদের। ফুলের গাছে গাছে শুরু করেছে কুহু কুহু গান। সে সুরে সুর মেলাতেই রাজপুরীর সংগীত মণ্ডপ হতেও ভেসে আসে সানাইয়ের জাগরণী সুর। ভৈরবীর আনন্দ-তানে সকলেই উৎফুল্ল।

পুলকিত হওয়ারই কথা। রাজপুরীতে রাজা দশরথের ঘুম ভেঙেছে বহু আগেই। তিন মহিষী— কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা তিনজনই তিন সুতিকাগারে। তিন সন্তানসম্ভবা রানিরই যে সন্তান প্রসবের দিন সেটি। তাই প্রায় রাত থেকেই ব্যস্ততা ও উদ্বেগ রাজপুরীতে। এক বাঁধনহারা আনন্দ আবার দুর্নিবার শঙ্কা— সব শুভ হবে তো— মঙ্গল হবে তো সব। তিন রানিই জন্ম দেবেন তো সুসন্তান। কোনো বিঘ্ন হবে না তো প্রসবে!

গুরু ও পুরোহিতরা জানিয়ে দিয়েছেন বহু আগেই। চৈত্রের এই শুক্লা নবমী বড়ো শুভদিন। বড়ো পুণ্যদিন। ওই দিনই হবে দেবী বাসন্তীর নবমী বিহিত পূজা। শেষ হবে নবরাত্রির নবম রাত্রিতে। সব মিলিয়ে অতীব পুণ্যার্জন।

এসব কারণেই সন্তান জন্ম নিয়ে স্বাভাবিক উদ্বেগ থাকলেও গুরুবাক্যে সকলে আবার ছিলেন আশ্বস্তও। তাই প্রতীক্ষা তখন কেবল সেই শুভ মুহূর্তের জন্য।

সকালের মিঠে রোদ তপ্ত হচ্ছে একটু একটু করে। সূর্য স্বাভাবিক নিয়মেই গগনপথে পশ্চিমমুখী। ক্রমে সূর্য আসে মধ্য গগনে। চৈত্রের সেই শুক্লানবমী তিথি যুক্ত হলো পুনর্বসু নক্ষত্রে। সূর্য, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্রের অবস্থান ছিল যথাক্রমে মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন রাশিতে। লগ্ন ছিল কর্কট এবং বৃহস্পতি ও চন্দ্র ছিল একসঙ্গে আলোকিত।

সময়টা বেলা ১২টা থেকে ১টা। সাম্প্রতিক গণনায় সুনির্দিষ্ট বেলা সাড়ে বারোটা । রানি কৌশল্যার প্রসব ঘরে বেজে উঠল শঙ্খ। দশরথ শুনলেন তিনি পিতা হয়েছেন পুত্রের। সে সংবাদে অপার আনন্দে ভাসতে থাকেন তিনি। তাঁর প্রথম পুত্র এই কৌশল্যানন্দনই হলেন রাম।

প্রতীক্ষার তখনও অবসান হয়নি। পরিবর্তন হলো রাশি নক্ষত্রের। জন্ম নিলেন কৈকেয়ী নন্দন ভরত একই তিথিতে মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে। ক্রমে সূর্যোদয়ে কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্র— যুগল সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করলেন রানি সুমিত্রা।

ভগবান বিষ্ণুর অংশে এই চার সন্তানের জন্মে কেবল রাজা দশরথ নয়, গোটা রাজ্যই মেতে উঠল আনন্দ উৎসবে। পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ আর দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে মুখরিত হলো চারিদিক। আলোয় আলোয় সেজে উঠল কেবল রাজপুরী নয়, রাজধানী অযোধ্যা তো বটেই— সারা কোশল রাজ্যই। সূর্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশধারার এই বিস্তারে পুলকিত বিশ্বলোক।

রাম এবং রামানুজরা আবির্ভূত হলেন চৈত্রের শুক্লানবমীতে। কিন্তু সালটা কত?

জন্ম তাঁর সাত হাজার বছর আগে

কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই তার রামায়ণে। কিন্তু রাম এবং অন্যান্যদের জন্মকালীন রাশি নক্ষত্রের যে উল্লেখ রয়েছে তাকে মূল ধরে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য নিয়ে একজন বিজ্ঞানী সমাধান করেছেন সেই সমস্যারও। অতি সম্প্রতি।

সমস্যাটা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন বহু বছর ধরেই। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতি অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা ছিল খুবই কঠিন। অবশেষে 'প্ল্যানেটারিয়াম সফট্ওয়্যার' নামে নতুন একটি সফট্ওয়্যারের নির্মাণের পর সমস্যাটা তুলনায় অনেকই সহজ হয়ে ওঠে। রামায়ণে প্রদত্ত গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থান তথ্যর ভিত্তিতে ওই সফট্ওয়্যারে অনুসন্ধান শুরু করেন দিল্লির আয়কর কমিশনার পুষ্কর ভাটনগর। দীর্ঘ গবেষণার পর সিদ্ধান্ত যে, রামচন্দ্র এই ধরাভূমিতে অবতীর্ণ হন ৫১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১০ জানুয়ারি বেলা সাড়ে বারোটার সময়। অর্থাৎ এই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭১৩৯ বছর আগে আবির্ভূত হন শ্রীরামচন্দ্র।

এর পরেও থাকে প্রশ্ন। রামায়ণে তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে রামের জন্ম হয় চৈত্র মাসের শুক্লানবমী তিথিতে। অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে। ১০ জানুয়ারি তো

কোনোক্রমেই চৈত্র মাসে হতে পারে না। তাহলে? তারাও সমাধান করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক্ষেত্রে তারা সূর্যের অয়ন-চলন গতি এবং বিষুববিন্দু পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বিষুববিন্দু বদলের ফলে সময়ের যে ব্যবধান হয় তার সমাধানে ৭২ বছর অন্তর একদিন করে সমন্বয় করা হয়। এভাবে ৭২০০ বছর ধরে এটি ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ১০০ দিন যুক্ত হয়। আর সেটা হলে ১০ জানুয়ারি দিনটা মার্চ-এপ্রিলে আসতেই পারে।

রামচন্দ্রর জন্ম সময় নিয়ে সংশয় বা সমস্যার সমাধান সূত্র পাওয়া গেলেও প্রশ্ন উঠেছে অন্য একটি বিষয় নিয়ে। সে প্রশ্নের বীজ রয়ে গিয়েছে বাল্মীকি রামায়ণেই। রামায়ণে আছে, শ্রীরাম ২৫ বছর বয়সে বনবাসে যান। ১৪ বছর বাদে ফিরে এসে তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটি ঠিকই আছে। গোলমালটা দেখা দেয় তারপরই। বলা হয়, 'দেশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষতানি চ। রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রথাস্যতি'।। (১/৯৭)। —এই ভাবে ১১ হাজার বছর ধর্মবোধে রাজ্য পালনের পর ভগবান রামচন্দ্র ব্রহ্মলোক গমন করেন। আর জিজ্ঞাসা ওইখানেই। যাঁর জন্ম ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭১৩৯ বছর বা ৫১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তিনি ১১ হাজার বছর জীবিত থাকলে তো জন্মকালটা অনেক পিছোতে হয়! তাছাড়া ১১ হাজার বছর বেঁচে থাকাটা একটা অতিরঞ্জিত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে নাকি?

এই অতিরঞ্জনের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহাভারত মহাকাব্যে। সেখানে বলা হয়েছে,— 'অহোরাত্রং মহারাজ তুল্যং সংবৎসরেণ হি'-(৩/৪৯/২১), অর্থাৎ ধর্ম অনুসারে জীবনযাপনকারী একজন মহারাজের জন্য একটি দিন একটি বছরের সমান। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৩০ দিন হিসেবে ১২ মাসে বছর গণনা করলে রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে ৩০ বছর ৬ মাস। সে অর্থে তিনি বেঁচে ছিলেন মোট ৬৯ বছর ৬ মাস। এবং এটা হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ৫১১৪ অব্দে হওয়াটা অসম্ভব নয়। গণনাতে কোনো অসুবিধে হয় না।

অন্তরজ্যোতি রাম

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সপ্তম অবতার রাম। রামকে বলা হয় আদিপুরুষ। অশুভের নাশ এবং শুভের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আবির্ভাব। মঙ্গলময় তিনি। মানুষের কল্যাণ তাঁর লক্ষ্য।

রামচন্দ্রর অবতরণ এবং রাবণ বধ— সবটাই রূপক আধারিত। রাম অর্থে জ্যোতি। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই রয়েছে এই জ্যোতি। সেই জ্যোতিকে প্রজ্বলন করাই মানুষের সাধনা। এই সাধনা স্থূল মন। মন বৃন্দাবন। মনই রামরাজ্যের অযোধ্যা। অযোধ্যার অর্থ— যুদ্ধহীন— হিংসাহীন একটি স্থান। যার অধিপতি জ্যোতিস্বরূপ শ্রীরাম।

রাম-কাহিনির মাতা কৌশল্যা হলো কুশলতা বা দক্ষতা। পিতা দশরথ হলেন দশ রথের অধিকারী। অন্য অর্থে এই দেহই যেন দশরথ। দেহের রয়েছে দশটি অঙ্গ। তার পাঁচটি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়— যথা চোখ, কান, রসনা, ঘ্রাণ ও ত্বক। অন্যদিকে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় হলো— হাত, পা, মুখ, জননেন্দ্রিয় ও পায়ু।

এই দশ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কুশলতার সঙ্গে অন্তরস্থ জ্যোতিকে চিনতে পেরে তাকে জাগিয়ে তুললেই দেখা পাওয়া যাবে জ্যোতি রূপ রামকে। তাতেই হবে মোক্ষ লাভ। ঘটবে মুক্তি।

মহর্ষি পতঞ্জলির কথায়, প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই রয়েছে এই জ্যোতি। সুপ্ত অবস্থায় তাকিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারলেই ঘটবে শুভ বোধের উদ্বোধন। সেই বোধই বধ করবে রাবণরূপী অশুভ শক্তিকে। রাবণ বিনাশ বা লঙ্কা দহনের মধ্য দিয়ে আসবে শুদ্ধতা। শুচিতা। তখনই লাভ করা যাবে পূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতাই হলেন অযোধ্যাপতি রাম। আর দর্শনের সাধনারই ক্রম শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন।

সংক্ষেপে, রামনবমী নয় নিছক একটি উৎসব। সীমাবদ্ধ নয় কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বিশ্বমানবের শুভবোধনে জাগিয়ে তোলাই রামনবমীর লক্ষ্য। সংকীর্ণতা নয়— উদারতাই রামনবমীর বৈশিষ্ট্য।

সবার পরশে পূর্ণ মহাঘট

হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রাচীনতর উৎসব রামনবমী। খ্রিস্ট পূর্বকাল থেকে চলে আসছে এই উৎসব। বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা যখন প্রবল, তখনও জাতপাত নির্বিশেষে সকলেরই এই উৎসবে যোগ দেওয়ার, সকলের সঙ্গে আনন্দকে ভাগ করে নেওয়ার ছিল অধিকার।

রামনবমীর উল্লেখ রয়েছে কালিকা পুরাণেও। বলা হয়েছে, পাঁচটি বড়ো পুণ্য অনুষ্ঠানের একটি হলো রামনবমী। বলা হয়, সঠিকভাবে এই আনুষ্ঠানিক পালন করতে পারলেই সাযুজ্যলাভ করা যায় রাম তথা পরব্রহ্মের। ঘটে মুক্তি।

রামনবমীর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে আদ্যাশক্তি মহামায়া বাসন্তী দুর্গার পূজা। বাসন্তীপূজার নবমীর দিনেই অবতীর্ণ হন শ্রীরাম এই ধরাধামে। আবার জীবনপথে চলার সময়ই বিনাশ করেন অশুভ শক্তির প্রতীক রাবণকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ কথা, রাবণ বধের জন্য দেবীর প্রসাদ তথা আনুকূল্য লাভে ঘুম ভাঙান তাঁর। সেই অকালবোধনের নবমী তিথিতেই তিনি পান দেবীর শুভাশিস— শক্তির সঙ্গে লিনে হন অপ্রতিরোধ্য। রাবণ হয় নিহত।

প্রসঙ্গত, সীতা কেবলই ছিলেন না রামের সহধর্মিণী। তিনি ছিলেন তাঁর শক্তিও। সেই সীতারও আবির্ভাব ঘটেছিল এমনই এক শুক্লা-নবমীতে। এটা বৈশাখী নবমী— খ্যাত যা সীতানবমী নামে।

এসবের প্রেক্ষাপটেই বলতে হয় শ্রীরামনবমী কেবলই একটি ধর্মানুষ্ঠান নয়। এটা ভারত কেন বিশ্বের জীবন-বিবেক—চিরন্তন বেদ। সর্বজনীন মঙ্গল এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠাই এর সারকথা। □

নেহরু ও ইন্দিরার সহায়তায় ইউএসএইড হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করেছিল

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি ইউএসএইডের অনেক গোপন কীর্তিকলাপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, বা সংক্ষেপে ইউএসএইড হলো গ্লোবাল ডিপ স্টেট বা আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার। ওয়ার্ল্ড ভিশনকে কোটি কোটি ডলার দিয়েছে ইউএসএইড। ওয়ার্ল্ড ভিশন হলো খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থা। কনভার্সন র‍্যাকেট বা ধর্মান্তরণ চক্র চালানোর জন্য এই সংস্থা কুখ্যাত। সম্প্রতি এই চক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা গিয়েছে যে, ধর্মান্তরণের মাধ্যমে হিন্দুদের খ্রিস্টানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ইভাঞ্জেলিস্ট বিলি গ্রাহাম ও বব পিয়ের্সের সহায়ক হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ইলন মাস্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা ইলন মাস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ইউএসএইডের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিপ্লব আনেন। ইউএসএইড প্রকৃতপক্ষে ছিল বিভিন্ন দেশে সরকার ফেলার বা রেজিম চেঞ্জ অপারেশনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। নামে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা হলেও বিভিন্ন দেশে এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সক্রিয় থাকে। কোনো দেশের সরকার আমেরিকার বশংবদ বা অনুগত না হলে সেই দেশে টাকা ঢেলে এরা সৃষ্টি করায় অরাজকতা। অচলাবস্থা সৃষ্টি করে সেই সরকারের পতন ঘটায়। ইউএসএইড বিশ্বজুড়ে নানা দেশে সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকা ঢেলেছে বলে খবর। মাস্কের কথায় এটি একটি অপরাধমূলক কর্মসূচি। মজার ব্যাপার হলো, ইউএসএইডকে নির্মূলের লক্ষ্যে একটি পুঁজিবাদী দেশের এই উদ্যোগে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বামেরা। বামেদের প্রতিক্রিয়া সামনে

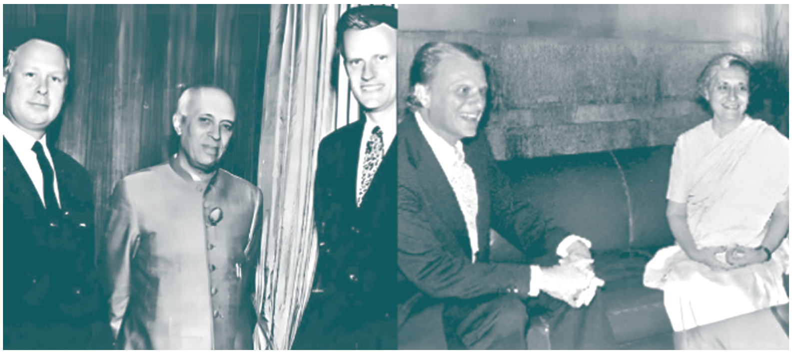

বিলি গ্রাহাম ও পিয়ের্সের সঙ্গে জওহরলাল নেহরু (বামে) এবং বিলি গ্রাহামের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী।

আসার আগে এই সংস্থার কুকীর্তি, যেসব কর্মকাণ্ডে তারা টাকা ঢেলেছে, গুপ্ত প্রশাসনের চালক কারা এবং কীভাবে তারা বিশ্বজুড়ে মারণযজ্ঞ চালিয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চালিয়েছে আমেরিকারই কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ইউএসএইড নামক এই চক্রের শ্যেন দৃষ্টি ছিল ভারতের ওপর। তাদের পেটোয়া সংবাদসংস্থাগুলিকে অর্থদান, বামপন্থী ইকোসিস্টেমের সমালোচকদের অসম্মান এবং ধর্মান্তরণ চক্র চালানোর জন্য অর্থসাহায্য— সর্বত্র পাওয়া গিয়েছে ইউএসএইড যোগ। ইউএসএইডের তরফে অন্যতম সর্বোচ্চ অর্থপ্রাপক হলো ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল। তারা পেয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। এদেরই শাখা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা পেয়েছে। মানবতাবাদী সংগঠনের পরিচয়ের আড়ালে এরা চালায় কনভার্সন র‍্যাকেট। খ্রিস্টীয় ইভাঞ্জেলিকালদের দ্বারা এরা সরলমতি হিন্দুদের খ্রিস্টান বানায়। হিন্দু শিশু ও মহিলারা এদের মূল লক্ষ্য। ভারত জুড়ে বহু বছর ধরে চলছে এদের এই ধর্মান্তরণ চক্র। ১৯৫১ সালে যাত্রা শুরু করে ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য এরা কোটি কোটি টাকা পেয়েছে। ২০২৪ সালে ভারত সরকার এদের এফসিআরএ, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স বাতিল করেছে। ফলে ধর্মান্তরণের লক্ষ্যে পরিচালিত এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্প্রতি ধাক্কা খেয়েছে।

> **ভারতে আসার আগে পিয়ের্স কোরিয়ায় ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়েছিলেন। তার আগে চীনে ১৭ হাজার জনকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট প্রশাসন তাকে বের করে দিলে, তিনি আর সেখানে ফিরতে পারেননি।**

২০০২ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশনের দাখিল করা আয়কর রিটার্ন থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এরা একটি খ্রিস্টিয় সংগঠন এবং এদের কাজ হলো দেশে দেশে খ্রিস্টমত প্রচার। এই রিটার্নে ইউএসএইডের থেকে অর্থপ্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। ওই বছর তারা ৫ হাজার কোটি টাকা পেয়েছে। 'এইড' মানে হলো সাহায্য। এই ছদ্মনামের আড়ালে তারা ধর্মান্তরণে

ফঃ ৫

টাকা ঢেলেছে।

১৯৫১ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন ভারতে কাজ করছে। ১৯৫৮ সালে কলকাতায় তারা অফিস খোলে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই সংগঠনের কাজ শুরু হয়, কে বা কারা এর প্রতিষ্ঠাতা আর তারা ভারতে কী করতে চেয়েছিল? ওয়ার্ল্ড ভিশন ও অন্যান্য খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতে ঢুকতে সাহায্য করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কাজে লিপ্ত ওয়ার্ল্ড ভিশনকে নেহরু দিয়েছিলেন সবরকম মদত। ইউএসএইডের অর্থে পরিচালিত ওয়ার্ল্ড ভিশনের এই দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল চীনে একটি ছোটো মেয়েকে ধর্মান্তরণ ও তার মগজধোলাইয়ের মাধ্যমে।

প্রথমে যে গল্প ছড়ানো হয় সেটা এইরকম। বব পিয়ের্স চীনে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি শিশুকে দেখে বিচলিত হন। এর তিন বছর পর তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশন খোলেন। তখন তার পকেটে ছিল মাত্র পাঁচ ডলার। তিনি বুঝেছিলেন যে, কাউকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এটি অতি সামান্য অর্থ; তিনি এও বুঝলেন যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে আরও অনেককে এই কাজে নিয়োজিত করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন প্রদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাজের সূত্রপাত। তারপর পূর্ব এশিয়ায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেবা কাজে এই সংস্থাটি মনোযোগ দেয়। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ভিশন বৃহত্তম খ্রিস্টীয় আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে কাজ-কারবার চালায়। নিজেদের ওয়েবসাইটে ওয়ার্ল্ড তার আসল স্বরূপের খুঁটিনাটি প্রকাশ না করে তার একটি মুখোশ জনসম্মুখে হাজির করে। ওয়েবসাইটে তারা দাবি করে যে, বব পিয়ের্স তাঁর শেষ ৫ ডলার অর্থ দান করেছিলেন চীনের একটি শিশুকে বাঁচাতে। শিশুটিকে তার বাবা-মা ফেলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু শিশুটিকে কেন পরিত্যাগ করা হয়েছিল ঘুণাক্ষরেও সে কথা বলে না এই ওয়েবসাইট। ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রচারিত গল্পে দেখানো হয় যেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যতম সর্বাগ্রগণ্য ইভাঞ্জেলিস্ট শুধু দরিদ্র শিশুদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন এবং তার শেষ কপর্দকটুকু গরিব কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই মানবতাবাদের পর্দাটা সামনে রাখাটা তাদের দরকার ছিল। তাই আসল সত্যিটা চেপে গিয়ে সত্য ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষ্য ছড়ানো হয়েছিল।

ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ লিবারেল আর্টসের রিলিজিয়াস স্টাডিজের ডিন অধ্যাপক টমাস জে ডেভিসের সম্পাদিত গ্রন্থ— রিলিজিয়ন ইন ফিলানথ্রপিক অর্গানাইজেশন্সে এই গল্পের পিছনে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত রহস্যটি উন্মোচিত হয়েছে। এতে পিয়ের্সের ভণ্ডামির মুখোশটি খসে পড়েছে। এই বইতে লেখা হয়েছে যে, চীনের ওই ছোটো মেয়েটি একটি স্কুলে পড়ত। সেখানে খ্রিস্টমত প্রচারে গিয়েছিল ইভাঞ্জেলিস্ট বব পিয়ের্স। আর তখনই ওই মেয়েটি খ্রিস্টমত গ্রহণ করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন ও সামারিটান্স পার্স— এই দুটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বব পিয়ের্স ১৯৪৭ সালে একজন ইভাঞ্জেলিস্ট-রূপে চীন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। পিয়ের্সের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ তার মধ্যেও একটি পরিবর্তন ঘটায়। তিনি চীনে এক তরুণ ইভাঞ্জেলিস্ট হিসেবে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন একজন পুরোদস্তুর খ্রিস্টান মিশনারি রূপে। তারপর ১৯৫০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন স্থাপন করেন, একটি ছোটো আমেরিকান ইভাঞ্জেলিকাল সংস্থারূপে। সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল এশিয়ার শিশুদের পরিচর্যা ও খ্রিস্টমত প্রচার। তিনি চীনে পৌঁছালে ডাচ মিশনারি টিম হোয়েলকেবোয়ের তাকে আমন্ত্রণ জানান চীনের একটি বিদ্যালয়ে খ্রিস্ট মত-বিষয়ক ভাষণ দেওয়া জন্য। ৪০০ জন চীনা ছাত্রী পড়ত সেই বিদ্যালয়ে। পিয়ের্স ভাষণ দিতে রাজি হলেন। তার ভাষণের পরের দিনই হোয়েলকেবোয়েরের এক ছাত্রী হোয়াইট জেড তার বাবাকে জানায় যে, সে খ্রিস্টমত গ্রহণ করেছে। তার বাবা তাকে এই কারণে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আরও একটি অনাথের দায়িত্ব নিতে হবে এই আশঙ্কায় হোয়েলকেবোয়ের পিয়ার্সকে সেই ছাত্রীটির বিষয়ে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'আপনি এর কী সুরাহা করছেন?' পিয়ের্স হোয়েলকেবোয়েরকে দশ ডলার দেন। সেটুকু অর্থই তার কাছে সেই সময় ছিল। তিনি কথা দেন যে, আমেরিকায় ফিরে তিনি প্রতি মাসে আরও অর্থ পাঠাবেন। দেশে ফিরে আমেরিকার লোকজনকে তিনি তার চীন ভ্রমণের কাহিনি শোনালেন। সেই থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন ও সামারিটান্স পার্স শুরু হওয়ার গল্প হিসেবে এটিকে আওড়ানো চালু হয়।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের ওয়েবসাইটে যা দাবি করা হয়, সেই বিষয়ে অনেক চমকপ্রদ তথ্য রয়েছে টমাস জে ডেভিস সম্পাদিত বইটিতে। বব পিয়ের্স চীনে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে বব পিয়ের্স তার চীন ভ্রমণকালে ১৭,০০০ জন চীনাকে খ্রিস্টমত গ্রহণ করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাবালক- নাবালিকাদের ধর্মান্তরণ বলপূর্বক ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরণ হলো মূলত কাউকে মানসিক বলপ্রয়োগে বিপরীতমুখী ও গোঁড়া মত-পথ বা উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট করা। মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরণের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে নানারকম প্রচার ও কারচুপি। পদ্ধতিমাফিক চেষ্টার পাশাপাশি এতে রয়েছে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রয়াস, বিপরীতধর্মী মত-পথের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, সেই মতাবলম্বীদের সব আদেশ ও উপদেশ সেই মতে অবিশ্বাসীদের মেনে চলতে বাধ্য করা। এই মগজ ধোলাইয়ের কাজটা ইভাঞ্জেলিস্টদের দ্বারা খুব সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হয়। সরাসরি ভীতিপ্রদর্শন, পীড়ন, মোহাবিষ্টকরণ বা হিংসাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগে এটা তারা করে না। অন্য ধর্ম বা মতাবলম্বীদের শিকার বানাতে তারা তাদের এমন প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করে, যাতে অন্য ধর্ম বা মতাবলম্বীদের নিজ ধর্ম বা মতের প্রতি বিরাগ জন্মায় এবং নিজ ধর্মের প্রতি নানাভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইভাঞ্জেলিস্টদের দ্বারা প্রচারিত মত-পথের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। এই কারণে ইভাঞ্জেলিস্টদের দ্বারা অনুসৃত ধর্মান্তরণের এই প্রক্রিয়া রীতিমতো জবরদস্তি এবং সম্পূর্ণ বেআইনি।

ধর্মান্তরণের এহেন প্রক্রিয়ায় শিকার ও শিকারির মধ্যে প্রথমে তৈরি হয় পারস্পরিক আনুগত্য ও আস্থার বোধ। তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালোবাসার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা ধর্মান্তরণে সহায়ক হয়। যেমন, একজন খ্রিস্টান পাদরি বা শিক্ষক একজন হিন্দু ছাত্রের মধ্যে খ্রিস্টমতের রীতিনীতি ও বিশ্বাসগুলিকে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করেন। বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকায় ছাত্রটি সহজেই সেই শিক্ষকের শেখানো ধারণাগুলির বশবর্তী হতে থাকে। তারপর খ্রিস্টমতের প্রতি আনুগত্যের সম্পর্কটিও সেই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। বিধর্মী মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সঞ্চারিত হতে থাকে ধর্মান্তরণের শিকার হওয়া হিন্দুদের চিন্তা-চেতনায়। ধর্মান্তরণের এই

প্রক্রিয়াটির মূলে রয়েছে মানুষের মনে নিজধর্মের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি। তাই এই ঘটনাগুলি হলো প্ররোচনামূলক অপরাধ। বিশেষত শিশুরা ব্যাপকভাবে এই মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়। কারণ ধর্মান্তরণের ফলাফল সম্পর্কে বোঝার বয়স বা পরিপক্কতা তাদের থাকে না।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাজকর্মের ভিত্তিটা ছিল বলপূর্বক ধর্মান্তরণ। শিশুদের মাথা চিবিয়ে খ্রিস্টমত গ্রহণে তাদের বাধ্য করার মাধ্যমে শুরু হয় ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাজ। টমাস ডেভিস সম্পাদিত বইটিতে বব পিয়ের্স একজন কট্টরপন্থীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এই বইটি অনুযায়ী পিয়ের্স নিজে ১৩ বছর বয়স থেকে ইভাঞ্জেলিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং 'ইয়ুথ ফর খ্রাইস্ট' নামক একটি কট্টরপন্থী খ্রিস্টান সংগঠনে যোগ দেন। এই ইয়ুথ ফর খ্রাইস্ট গোষ্ঠীটি ধর্মান্তরণের কার্যকলাপ চালানোর জন্য সুপরিচিত। ১৯৪৪ সালে পিয়ের্স ইভাঞ্জেলিস্ট রূপে এই সংগঠনে যোগ দেন এবং তারপর এই সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই কাজে তার সহযোগী ছিলেন বিলি গ্রাহাম। এদের সঙ্গে মিলে পিয়ের্স গোটা আমেরিকার নজর কাড়েন। রাজনীতিবিদ, খ্রিস্টমত প্রচারক মিশনারি এবং সংবাদপত্র জগতের লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ১৯৪০-এর গোটা দশক জুড়ে হাজারে হাজারে তরুণ আমেরিকার শহরগুলিতে শনিবার রাতে পিয়ের্সের সমাবেশগুলিতে জড়ো হতো। খ্রিস্টমতের প্রতি তাদের এবং আমেরিকার সুশীল সমাজের বিশ্বাস এইভাবে দৃঢ় হতে থাকে। আমেরিকার গণ্ডির বাইরে গোটা পৃথিবীতে সেই বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো। ওই সংগঠনের সভাপতি টরি জনসন টাইম ম্যাগাজিনকে জানিয়েছিলেন যে, তার সংগঠনের লক্ষ্য ছিল আমেরিকায় খ্রিস্টমতের পুনর্জাগরণ এবং বিশ্বজুড়ে তৎকালীন প্রজন্মকে খ্রিস্টানে পরিণত করা।

ডেভিসের বইটিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইয়ুথ ফর খ্রাইস্ট একটি আক্রমণাত্মক বাহিনী গঠন করেছিল যারা বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে। বব পিয়ের্স নিজেকে পরবর্তী বিলি গ্রাহাম রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। গ্রাহাম ছিলেন আমেরিকার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ খ্রিস্টমত প্রচারক। ধীরে ধীরে পিয়ের্স এশিয়ার বিলি গ্রাহাম হিসেবে পরিচিত হলেন। তাকে বলা হতো— ঠাণ্ডা মাথার যোদ্ধা। পিয়ের্সের লক্ষ্য ছিল এশিয়ায় কমিউনিজমকে রোখা। তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল খ্রিস্টান লিডারশিপ' নামক একটি সংগঠনের এশিয়া রিজিয়নের প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে মার্কিন রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান নেতৃত্ব একজোটে বৈদেশিক সম্পর্ক মজবুত করার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টমতের পুনর্জাগরণের কাজে লিপ্ত হয়।

বব পিয়ের্স ছিলেন সক্রিয় ইভাঞ্জেলিস্ট বা খ্রিস্টমত প্রচারক। তার পাখির চোখ ছিল এশিয়ার মানুষকে খ্রিস্টান বানানো। তার এই ইভাঞ্জেলিকাল কার্যকলাপ এবং মার্কিন বিদেশ নীতি সেই সময় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের রাজস্বের ৫০ শতাংশ তাকে দেওয়া হতো। ১৯৫০ সালে বব পিয়ের্স 'শিশুদের ব্যয়বহন'-এর একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কোরীয় যুদ্ধে অনাথ হওয়া হাজার হাজার শিশুকে দেখভালের জন্য গৃহীত এই প্রকল্পটি ছিল ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রথম কাজ। ১৯৫১ সালে ভারতে তাদের কাজ শুরু করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। ১৯৫৮ সালে কলকাতায় একটি এক কামরার অফিস খোলে তারা। ১৯৬০ সালে শিশুদের দেখভালের জন্য ভারতে তারা চাইল্ড কেয়ার ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার প্রকল্প শুরু করে। শিশুকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে তারা কাজ করতে থাকে।

শিশুকল্যাণমূলক কাজকর্মের আড়ালে তাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। ভারতে আসার আগে পিয়ের্স কোরিয়ায় ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়েছিলেন। তার আগে চীনে ১৭ হাজার জনকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট প্রশাসন তাকে বের করে দিলে, তিনি আর সেখানে ফিরতে পারেননি। এরপর কোরিয়ায় ঢুকে জারি রাখলেন ধর্মান্তরণের কাজ। কিছু মানুষকে ধর্মান্তরিত করলেন বটে, কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট সেনা ঢুকলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। তাও পিয়ের্স দমবার পাত্র নন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কিছু নিবন্ধ লিখে যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসেবে আবার কোরিয়াতে ঢুকলেন পিয়ের্স। সেখানে ঢুকে যুদ্ধে আহত খ্রিস্টানদের শুশ্রূষা করলেন। ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি কোরিয়াতে ছিলেন। তার কন্যার লেখা বই— ম্যান অফ ভিশনে উল্লেখিত হয়েছে যে তিনি ভারতে সক্রিয় ছিলেন ১৯৫৩ সালে। ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে লেখা তার চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি ভারতে হিন্দু ও শিখদের ধর্মান্তরিত করছেন। ১৯৫৬-'৫৭ সালেও তিনি খ্রিস্টমত প্রচারে ভারতে আসেন এবং আবারও শিশুদের টার্গেট করলেন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে যে, তারা ভারতে কাজ শুরু করেছিল ১৯৫১ সালে এবং ১৯৫৮ সালে কলকাতায় তারা অফিস খুলেছিল। কিন্তু এর আগে পিয়ের্সের ভারত সফর এবং তার দ্বারা যথেচ্ছ ধর্মান্তরণের কথা বেমালুম চেপে গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ভিশনের ওয়েবসাইট। ১৯৫৬-'৫৭ সালে তার ধর্মান্তরণের কাজ চলাকালীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বব পিয়ের্স। একত্রে আলাপচারিতারত বিলি গ্রাহাম, জওহরলাল নেহরু ও বব পিয়ের্সের ছবিটি জর্জ ফক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা আছে।

বিলি গ্রাহাম ছিলেন একজন ইভাঞ্জেলিস্ট ও সাদার্ন ব্যাপটিস্ট মিনিস্টার। ধর্মান্তরণের কাজ করার সময়ে তিনিও বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি বলেছিলেন সব জায়গায় সবাই তাকে জিজ্ঞেস করত যে, ভবিষ্যতে কোনো আশা আছে কিনা। সেই হতাশাগ্রস্তদের তিনি উত্তর দিতেন যে, 'আছে, তবে যিশুর মাধ্যমে'। লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের উৎসাহ ও মদতে তিনি বোম্বে, মাদ্রাজ, কোট্টায়াম, পালামকোট্টা, দিল্লি ও কলকাতায় ক্রুসেড, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ধর্মযুদ্ধ চালান। ধর্মান্তরণের কাজে গতি আনতে পররাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সঙ্গে ছিলেন পিয়ের্স। ধর্মান্তরণ ও ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭২ সালে বিলি গ্রাহাম ভারতে ফিরলেন। ওই বছর ২৪ নভেম্বর 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি নিম্নরূপ :

'প্রখ্যাত আমেরিকান ইভাঞ্জেলিস্ট ড. বিলি গ্রাহাম আজ রাতে আশা প্রকাশ করেছেন যে তার ভারত ভ্রমণ ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে সাহায্য করবে। তিনি ইন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রথাভঙ্গ করে তাকে নাগাল্যান্ড যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। ইন্দিরার জন্য তার কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একটি বার্তা ছিল, কিন্তু বার্তাটি তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করতে রাজি হননি। প্রথা ভেঙে তাকে নাগাল্যান্ড যাওয়ার অনুমতি দান— সবটাই ছিল ইন্দিরা, মার্কিন প্রশাসন ও খ্রিস্টীয় মতপ্রচারকদের যৌথ প্রয়াস, হিন্দুদের খ্রিস্টানীকরণের উদ্যোগ।' □

স্বপ্ন হলো সফল

নিলয় সামন্ত

মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পেলেন ভারতের চার ক্রিকেটার। ফাইনালের পর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) প্রতিযোগিতার সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে। তাতে রয়েছেন বিশ্বজয়ী চার ক্রিকেটার।

একপেশে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে দ্বিতীয়বার মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই নিয়ে পর পর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। নিকি প্রসাদের দলের একাধিক ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাওয়া গোঙ্গাদি তৃষা। তিনি ছাড়া ভারতের আরও তিন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা একাদশে। তাঁরা হলেন জি কমলিনী, আয়ুষী শুক্লা এবং বৈষ্ণবী শর্মা।

আইসিসি দল নির্বাচন করেছে দ্বাদশ ব্যক্তি-সহ। প্রথমেই নাম রয়েছে তৃষার। প্রতিযোগিতায় তিনি ৩০৯ রান করেছেন। তাঁর গড় ৭৭.২৫। স্ট্রাইক রেট ১৪৭.১০। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১০০। ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরে রয়েছে কমলিনীর নাম। প্রতিযোগিতায় তিনি ৩৫.৭৫ গড়ে ১৪৩ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১০৪.৩৭। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫৬। ব্যাটিং অর্ডারের ন' নম্বরে রয়েছেন আয়ুষী। ৫.৭১ গড়ে প্রতিযোগিতায় তিনি ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ৩.০১। তাঁর সেরা বোলিং ৮ রানে ৪ উইকেট অর্ডারের ১১ নম্বরে আছেন বৈষ্ণবী। ৪.৩৫ গড়ে তিনি বিশ্বকাপে ১৭টি উইকেট নিয়েছেন। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ৩.৩৬ রান। তাঁর সেরা বোলিং ৫ রানে ৫ উইকেট।

প্রথম একাদশে ভারতের চারজন ছাড়া আছেন রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকার দু'জন, ইংল্যান্ডের দু'জন, অস্ট্রেলিয়ার একজন, নেপালের একজন এবং শ্রীলঙ্কার একজন ক্রিকেটার। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রয়েছেন আফ্রিকার এক ক্রিকেটার। তিতাস সাধুরা যেবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন, সুযোগ পাননি নিকি প্রসাদ। বাদ পড়ার হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন তরুণী। তাঁর উপরে ভরসা রেখেছিলেন তাঁর স্কাউট নিসার্গ নায়েক। নিকি বাদ পড়ার পরেই তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, 'পরের বার অধিনায়ক হয়ে ভারতকে বিশ্বকাপ তুলে দেবে।' নিসার্গের সেই কথাই ফলে যায়। ২০২৫-এ অধিনায়ক হন কর্ণাটকের তরুণী। বিশ্বকাপ তুলে দেন ভারতকে।

ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার পরে তাঁর স্কাউটকে ধন্যবাদ জানান নিকি। বলেন, 'নিসার্গ ভাইয়া দু'বছর আগেই বলেছিলেন, আমার হাতে একদিন বিশ্বকাপ উঠবে। এবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার পরে মনে হয়েছিল এটাই জীবনের সেরা প্রপ্তি। আমাকে কাপ তুলে দেখাতেই হবে।' আরও বলেন, 'ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পরে নিসার্গ ভাইয়ার সেই কথাটাই আমার প্রথমে মনে পড়ে। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরে আমি যখন একেবারে ভেঙে পড়ি, নিসার্গ ভাইয়া আমার পাশে দাঁড়ায়।' হরমনপ্রীত কউরের ভক্ত নিকি। তাঁর মতোই আগ্রাসী ভঙ্গিতে দলকে নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করেন। চলতি বিশ্বকাপে একটি ম্যাচও হারেননি। কীভাবে সম্ভব হলো এই সাফল্য? নিকির কথায়, 'দলগত প্রয়াসেরই ফল। আমাদের বোলাররা প্রত্যেকটি ম্যাচে সফল হয়েছে। ফিল্ডিংও অসাধারণ করেছে। ব্যাটারদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'তৃষার মতো একজন অলরাউন্ডারকে আমরা পেয়েছি। ও দলে না থাকলে এত সহজে সব ম্যাচ জিততে পারতাম না। সেমিফাইনাল, ফাইনালের মতো ম্যাচে ও একাই দলকে টেনেছে।' নিকির পরবর্তী স্বপ্ন কী? ভারতীয় অধিনায়ক বলে দিলেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও ভালো খেলতে চাই। ভারতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্নই দেখে আসছি। দেখা যাক কী হয়।'

আইসিসির নির্বাচিত দল : গোঙ্গাদি তৃষা (ভারত), 'জিমা বোথা (দক্ষিণ আফ্রিকা), ড্যাভিনা পেরিন (ইংল্যান্ড), জি কমলীনি (ভারত), কাওইমে ব্রে (অস্ট্রেলিয়া), পূজা মাহাতো (নেপাল), কায়লা রেইনেকে (দক্ষিণ আফ্রিকা, অধিনায়ক), কে টি জোন্স (ইংল্যান্ড, ইউকেট রক্ষক) আয়ুষী শুক্লা (ভারত), গমোদি প্রবোদা (শ্রীলঙ্কা), বৈষ্ণবী শর্মা (ভারত), এনথাবিসেং নিনি (দ: আফ্রিকা, দ্বাদশ ব্যক্তি)। □

মিনি ব্রাজিলে উত্তরণ : 'বেন্ড ইট লাইক বিচারপুর'

অজয় ভট্টাচার্য।। মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার একটি সাধারণ গ্রাম বিচারপুর। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১০৩তম এপিসোডে জনজাতি অধ্যুষিত এই গ্রামটির উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্রামটি বর্তমানে ভারতের 'ফুটবল নার্সারি' নামে পরিচিত। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের ৮০ জনেরও বেশি ফুটবলার উপহার দেওয়া মধ্যপ্রদেশের এই প্রত্যন্ত গ্রামটি আজ যেন এক 'ছোটো ব্রাজিল'। দরিদ্র এই গ্রামটি একসময় ছিল অবৈধ মদ তৈরির আখড়া। সেই গ্রামটি থেকেই আজ হয়ে চলেছে অসংখ্য ফুটবলারের উত্থান। গ্রামের ভোল পালটে দিতে একদা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই গ্রামেরই ৬৫ বছর বয়সি সুরেশ কুণ্ডে। এই গ্রামের তিনিই প্রথম ফুটবলার। খেলতে যেতেন গ্রাম থেকে দূরে রেলওয়ে মাঠে। ধীরে ধীরে অন্যদেরও ফুটবলের প্রতি উৎসাহিত করে তোলেন। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

সম্প্রতি আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রামটির ইতিবৃত্ত পুনরায় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েক দশক আগেও যে গ্রামের অধিবাসীরা মহুয়া ফলের রস থেকে অবৈধ মদ তৈরি করতেন, সেই গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিমুখটিই বদলে গিয়েছে ফুটবল খেলার দৌলতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৯০০ জন, যার মধ্যে ৪৪৪ জন পুরুষ এবং ৪৫৬ জন মহিলা। গ্রামের ৩.৫৬ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি এবং ৭৪.৭৮ শতাংশ মানুষ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই গ্রামটি আজ সমগ্র ভারতে ফুটবল খেলায় পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। জাতীয় স্তরের ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন এই গ্রামের সানিয়া কুণ্ডে, রজনী সিংহ, লক্ষ্মী সহিস, অনিল সিংহ গোণ্ড, হনুমান সিংহ।

ফুটবল কোচ হিসেবে ফুটবলে এই গ্রামের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন রঈস আহমেদ। ৫৩ বছর বয়সি এই ব্যক্তি শাহদোল জেলার একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক। জাতীয় দলের ফুটবলার হওয়ার সুবাদে বিচারপুরের ছেলে-মেয়েদের ফুটবল প্রতিভা চিনে নিতে পেরেছিলেন এই ফুটবল প্রশিক্ষক। ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার অনুগামী রঈস আহমেদ অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত থাকাকালীন জাতীয় স্তরে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন। ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগদানের পর ফুটবল কোচ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি কলকাতা-স্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে ফুটবল কোচিঙের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে আসেন শাহদোলে। স্কুলের ছুটির পরে তিনি বাইকে চড়ে বিচারপুরে আসতেন। ছেলে-মেয়েদের ফুটবল কোচিং দিয়ে বাড়ি ফিরতেন। ফুটবল খেলার গুরুত্ব অনুধাবন করে, ফুটবল কোচ আহমেদ স্যারের উৎসাহে গ্রামের ছেলেরা মহুয়ার নেশা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের পরিবার-পরিজনও মহুয়া থেকে মদ তৈরির পেশা ছেড়ে দেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রথম সাফল্যের মুখ দেখে এই গ্রাম। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের অনূর্ধ্ব ১৪ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করে বিচারপুরের ছেলেরা। ২০০৪ সাল থেকে গ্রামের মেয়েরাও ফুটবল খেলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সমগ্র বিচারপুর গ্রাম তথা শাহদোল জেলা একটি ফুটবল হাবে পরিণত হয়। পুরো শাহদোল ডিভিশন জুড়ে আজ ১২০০টি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর এই অঞ্চলে ৮০ থেকে ৮৫টি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয় বলে জানিয়েছেন শাহদোলের ডিভিশনাল কমিশনার রাজীব শর্মা। এই অঞ্চলের ফুটবলের উন্নতিতে

মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে প্রতি বছর থাকে একটি বিশেষ বাজেট বরাদ্দ। রাজ্য সরকার ও ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন-সহ বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তায় বিচারপুর গ্রাম আজ ভারতের বুকে ফুটবল খেলায় একটি 'মডেল গ্রাম' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গ্রাম থেকে উঠে আসা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের ফুটবলাররা ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন এবং ফুটবল কোচ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থায় চাকরিও পেয়েছেন। বিচারপুরে স্পোর্টস্ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) ২০২৩ সালে একটি ফিডার সেন্টার স্থাপন করেছে। বিচারপুর থেকে উঠে আসা জাতীয় স্তরের ফুটবলার লক্ষ্মী সহিস এই ফুটবল প্রতিভা অন্বেষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ফুটবল খেলার স্কিল ও টেকনিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেখেছে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর। একদা এই অখ্যাত গ্রামের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি আজ হয়ে উঠেছে ফুটবল। □

নবাঙ্কুর

বুদ্ধিবলে শত্রু বিনাশ

বনের মধ্যে মস্ত এক বটগাছ। সেই গাছের মগডালে বাসা বেঁধে বাস করত এক কাক-দম্পতি। আবার সেই গাছের কোটরে থাকত এক কালকেউটে। কালকেউটের দৌলতে কাক-দম্পতি তাদের ছানাদের মুখ দেখতে পেত না। ডিম পাড়লেই

কালকেউটে সেগুলোকে সাবাড় করে দিত। কালকেউটের সঙ্গে লড়াই কারার সাহস তো কাক-দম্পতির নেই। তাই বেচারা আর কী করে। মনের দুঃখ মনেই রেখে দেয়।

বটগাছের কাছাকাছি অন্য একটা গাছের গোড়ায় গর্তের মধ্যে বাস করত এক শেয়াল। কাক-দম্পতির সঙ্গে তার ভারি ভাব। কাক-দম্পতি এবার গেল বন্ধু শেয়ালের কাছে পরামর্শ করতে। কী করে ওই কেউটের হাত থেকে তাদের ডিমগুলোকে রক্ষা করা যায়।

বন্ধু শেয়াল খুব আদর করে তাদের বসাল। বলল— আমার কী সৌভাগ্য, অনেকদিন পর তোমাদের দেখা পেলাম। বলো, কেমন আছ তোমরা?

শেয়ালের কথায় কাক-বউয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। কাক জানাল তাদের প্রতিবেশী ওই কালকেউটের কথা। কীভাবে সে তাদের ডিম খেয়ে নিচ্ছে, সব খুলে বলল।

শেয়াল তাদের আশ্বস্ত করে বলল, শান্ত হও তোমরা। এতদিন একথা আমাকে জানাওনি কেন? তোমরা আমার পরম বন্ধু। দেখি আমি তোমাদের কী করতে পারি।

শেয়াল জানে অমন হিংস্র কালকেউটের সঙ্গে এমনিতে পেরে উঠবে না। তাকে ঘায়েল করতে হবে বুদ্ধির জোরে। সে বলল, শোনো কাকভায়া, তোমাদের একটা পথ বলে দিচ্ছি। তুমি দেরি না করে কালই শহরে চলে যাও। সর্বত্রই তোমাদের আনাগোনা আছে। তোমাকে একটা সোনার হার ঠোঁটে করে নিয়ে আসতে হবে। আর সেটা এনে একেবারে কেউটের বাসায় ফেলে দেবে। তারপর দেখো না মজাটি। যাও, যা বললাম তাই করো।

পরদিন সকাল হতেই কাক তার বউকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। উড়তে উড়তে চলে এর রাজবাড়িতে। দেখল, রাজকন্যা তার সখীদের নিয়ে পুকুরে স্নান করছে। পুকুরপাড়ে রাজকন্যার কাপড়চোপড় আর সোনার অলংকার রাখা আছে। দামি পাথর বসানো হার— রোদে কেমন ঝিকিয়ে উঠছে।

গাছের ডালে বসে কাক আর তার বউ সবকিছু লক্ষ্য করছিল। কাক-বউ বলল— শোনো আমিই কাজটা করব। তুমি শুধু আমার উপর নজর রোখো। এই বলে সে গাছের আড়াল থেকে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল। তারপর সাঁ করে নেমে এসে ঠোঁটে করে সেই হারটি তুলে নিয়ে বটগাছে নিজের বাসার দিকে উড়তে শুরু করল। কাকও কাকগিন্নির পেছনে পেছনে ছুটল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাজকুমারীর সখীরা হইহই করে উঠল। তাদের চিৎকার শুনে রাজপ্রহরীরা ছুটে এল। লাঠি সড়কি নিয়ে তারা ছুটল কাক-দম্পতির পেছনে পেছন।

এদিকে এগাছ-সেগাছ করতে করতে কাকগিন্নি উড়ে এসে বসল নিজেদের সেই বটগাছে। তারপর কেউটের কোটর লক্ষ্য করে হারটি টুক করে তার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর দুজনে মিলে লক্ষ্য করতে লাগল এরপর কী ঘটে।

ইতিমধ্যে রাজপ্রহরীরা ছুটতে ছুটতে এসে ওই বটগাছের তলায় এসে থামল। হাড়ের খানিকটা বাইরের দিকে ঝুলছিল। একজন লাঠি নিয়ে গাছের কোটরের কাছাকাছি যেতেই দেখল মস্ত একটা কেউটে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে।

ব্যাস, আর যায় কোথায়! সপাসপ পড়তে লাগল লাঠির আঘাত। কেউটের মাথা থেঁতলে গেল। হাড়গোড় ভেঙে গেল। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

সোনার হার উদ্ধার হলো। প্রহরীরা ফিরে গেল রাজবাড়িতে। কাক আর কাকগিন্নির কী হলো? তাদের আর কোনো দুঃখ রইল না। সুখে সংসার করতে লাগল।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

বান্দিপুর

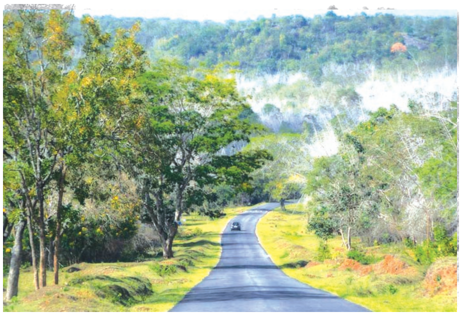

বান্দিপুর জাতীয় উদ্যান কর্ণাটক রাজ্যের চামরাজনগর জেলায় অবস্থিত। এই উদ্যান ৮৬৮.৬৩ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। ১৯৭৩ সালে বাঘ্র সংরক্ষণাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যানটি উত্তরে কাবিনীনদী এবং দক্ষিণে মোয়ার নদী দ্বারা বেষ্টিত। নগুনদী উদ্যানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। উদ্যানের মধ্যস্থলে পাহাড়ের শীর্ষে একটি মন্দির রয়েছে। উদ্যানে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রয়েছে, তারমধ্যে সেগুন, চন্দন এবং ক্লাম্পিং বাঁশ উল্লেখযোগ্য। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, গৌড়, ঢোল, ডোরাকাটা হরিণ, সম্বর হরিণ, চার শিংঅলা হরিণ, স্লথ ভল্লুক, ধূসর ল্যাঙ্গুর, সোনালি শেয়াল,বন্য শুয়োর। ২০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। তার মধ্যে নীল ময়ূর উল্লেখযোগ্য।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬১

কতি সন্তি? – কতগুলো আছে?

পঞ্চ বালকা: সন্তি। – পাঁচজন বালক আছে।

কতি বালকা: সন্তি? – কতজন বালক আছে?

অভ্যাসং কুর্ম: –

ষট্ ছাত্রা: সন্তি। অষ্ট চমষা: সন্তি। নব আসন্দা সন্তি। সপ্ত লেখন্য: সন্তি। একাদশ ফলানি সন্তি। দশ মহিলা: সন্তি। সপ্ত গায়িকা: সন্তি। পঞ্চ দ্রোণ্য: সন্তি। অষ্ট ভগিন্য: সন্তি।

প্রয়োগং কুর্ম: –

৫–অঙ্গুলী, ৮– শুনক:, ১২– কন্দুকম্, ৯– লেখক:, ১৫– স্থালিকা। ৭–গৃহম্, ১০– মালা, ৬– নদী।

ভালো কথা

ছাওয়া

সেদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'ছাওয়া' মুভি দেখলাম। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বীরত্বের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। কিন্তু তাঁর পুত্র সম্ভাজী মহারাজের বীরত্বের কথা ইতিহাসে পড়ানো হয় না। আমি ভাবতাম শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পরই মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। কিন্তু শিবাজী মহারাজের মতোই সম্ভাজী মহারাজও বীরবিক্রমে সমানভাবে আওরঙ্গজেবের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন, তা ছাওয়া মুভি দেখার পর বুঝতে পারলাম। আমার এও জানা ছিল না যে শিবাজী মহারাজের মতোই সম্ভাজী মহারাজকেও মহারাষ্ট্রের মানুষ 'ছত্রপতি' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। মুভিটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

শৈবাল সরদার, দ্বাদশ শ্রেণী, রানাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রিয় লিচু

সপ্তর্ষি রায়, পঞ্চম শ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠমাসে হয় গ্রীষ্মকাল
রোদে পুড়ে ঘামে ভিজে মানুষ নাজেহাল।
আম জাম কাঁঠাল আর লিচুর স্বাদে
গরমের মধ্যেও মানুষ আনন্দেতে মাতে।
বেলি জুঁই টগর আর রজনীগন্ধার গন্ধে
বাতাস ভরিয়ে রাখে সারাটি সন্ধ্যে।

আছে যত পুকুর ডোবা নালা আর খাল
শুকিয়ে সব ফুটিফাটা মানুষ হয় নাকাল।
এরই মাঝেই বয়ে যায় কালবোশেখির ঝড়
ভেঙেচুরে তছনছ গরিব মানুষের ঘর।
তবু আমার ভলো লাগে এই গ্রীষ্মকাল
এই সময়ই প্রিয় লিচু পেকে লালে লাল।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

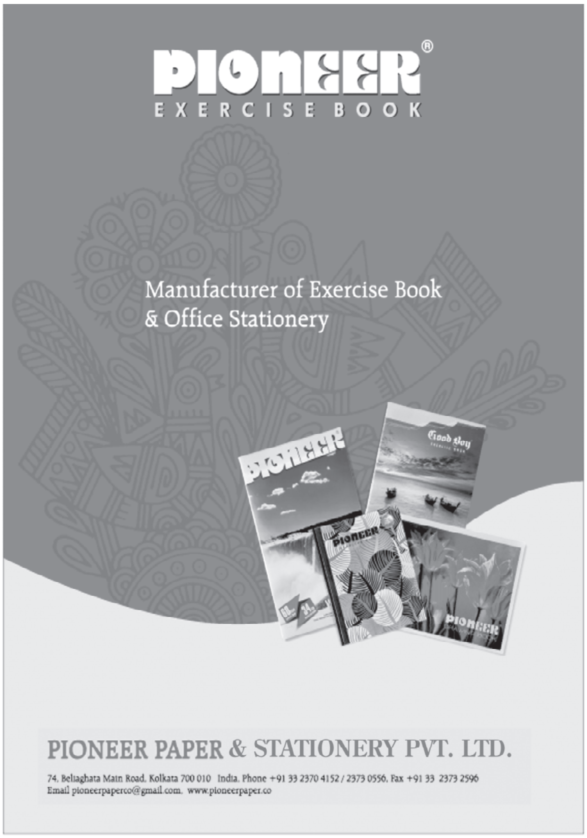

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

শ্রীরামচরিত

‘বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি’

গোপাল চক্রবর্তী

শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সাহিত্যে এক অত্যুজ্জ্বল নাম এবং সর্বাধিক চর্চিত চরিত্র। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র ধরণীর ভার হরণের জন্য নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অথবা মানব রামচন্দ্র চরিত্রগৌরবে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন— এ প্রশ্ন চিরন্তন। শ্রীরামচন্দ্র মানুষ হলেও আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়াধিদেবতা। আবার দেবতা হলেও তিনি রক্তমাংসের মানুষ। উভয় আদর্শের স্রোত রামচরিত্র রূপ প্রয়াগে মিলিত হয়েছে।

রামায়ণ রচনার আগে বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ‘এমন মানুষ কে আছে, যার মধ্যে সমগ্রা গুণলক্ষ্মী বিরাজমানা?

তখন নারদ বললেন— ‘এত গুণবান পুরুষতো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না। তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তার কথা বলি শোন।’

দেবেষ্বাপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিরগুণৈরযুর্তম্।
শ্রুয়তাং তু গুণৈরেভিযোযুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।।

রামচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রীতির কল্যাণের ভালোবাসার সত্যধৃতির মানুষী বিগ্রহ। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল মাধুরী। নারদ তাই রামচন্দ্রের বর্ণনা দিয়েছেন ‘নরচন্দ্রমা’ বলে। রাম নামেও রয়েছে সেই অর্থ। যা সবকিছুকে আনন্দ দেয়।

রাক্ষসদের হত্যা করে যজ্ঞক্ষেত্র, তপোবনকে নিরুপদ্রব করার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা থেকে রাজা দশরথের অনুমতি ক্রমে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চলেছেন তাঁর তপোবনের দিকে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন তাঁরা। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেনালেন কত নগর, জনপদ, জাতি জনজাতি। বিচিত্র তাঁদের ভাষা। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিচিত্র সংস্কৃতি।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন রাম, লক্ষ্মণ। এক অন্ধকার ভয়ংকর অরণ্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। বিশ্বামিত্র বললেন—

—‘রাম, এই বনেই থাকে রাক্ষসী তাড়কা। তুমি তাকে বধ কর। স্ত্রী হত্যা হবে বলে দ্বিধা করো না। প্রজার কল্যাণের জন্য এ তোমার কর্তব্য। তোমার রাজধর্ম। রাজাকে সবই করতে হয়। নিষ্ঠুর, নৃশংস, দোষের বা পাপের বলে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।’

নৃশংসমনুশংসং বা প্রজারক্ষাকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষ বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা।।
(আদিকাণ্ড—২৫/১৮)

শ্রীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোরকোমল প্রাণ। সরল হৃদয় কিশোরচিত্তে এই ভয়ংকর পরিবেশে বিশ্বামিত্র দিচ্ছেন কঠোর রাজধর্মের নীতি শিক্ষা। রামের কোমল হৃদয় তন্ত্রীকে তিনি বুঝি ললিতে-কঠোরে সুতীক্ষ্ণ করে তুলতে চান। রামকে অযোধ্যার রাজদণ্ড ধারণ করতে হবে। রাজাকে, বিশেষ করে রামকে তো ফুলের মতো কোমল হলে চলবে না, তাঁকে আবার হতে হবে বজ্রের মতো কঠোর। তাই তিনি রামকে দীক্ষা দিয়েছেন, এই ভয়ানক পরিবেশে নিয়ে এসেছেন, এবার সেই শুদ্ধ নরমপাত্রে ঢেলে দিচ্ছেন তরল অগ্নির মতো কঠোরতর শিক্ষা। বলেছেন— হত্যা কর, আবার শুধু হত্যা নয়, নারী হত্যা। বিনা প্ররোচনায়। তাড়কা তাঁদের আক্রমণ করেনি। বিশ্বামিত্র এখানে যজ্ঞে ব্রতী হননি, তিনি নিজেই তাড়কাকে বধ করতে পারেন। তা না করে তিনি রামকে বলছেন বধ কর। রামের মনে দ্বিধা আসা স্বাভাবিক। তাই বিশ্বামিত্র রামের মনকে শক্ত করার

জন্য অবতারণা করছেন নানা যুক্তি, দৃষ্টান্তের। বলছেন, স্বয়ং ইন্দ্র একদা অসুর বিরোচনের কন্যা মন্থরাকে বধ করেছিলেন। মন্থরা না হয় ছিল অসুর কন্যা। কিন্তু মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পতিব্রতা ধর্মশীলা, শুক্রাচার্যের মাতা, তিনি অসুরদের প্রতি পক্ষপাত করে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য স্বয়ং বিষ্ণু ওই সাধ্বী রমণীকে বিনাশ করেছিলেন।

বিশ্বামিত্র বলছেন— রাম, মনে কোনো সংকোচ রেখো না। রাক্ষসীকে বধ কর— 'জহি মচ্ছাসনান্নৃপ।'

রাম মনে মনে ভাবলেন— আসবার সময় পিতা আমাকে আদেশ করেছেন, বিনা দ্বিধায় ঋষির বাক্য পালন করতে। তাই পিতার বাক্যের গৌরব রক্ষার্থে আমি ঋষির নির্দেশ পালন করব। এই ভেবে রাম ধনুকে টঙ্কার দিলেন, অরণ্য আকাশ প্রকম্পিত হলো। তাড়কা বধ হলো।

শ্রীরামচন্দ্রকে হতে হবে আদর্শরাজা, প্রজারঞ্জক, সুবিচারক, পরবর্তীকালের নৃপতিবর্গ এবং রাজ্য সমূহের আদর্শ, মর্যাদা পুরুষোত্তম, প্রতিষ্ঠা করতে হবে রামরাজ্য। তাই বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার অজুহাতে দশরথের রাজছত্রতল থেকে রামকে নিয়ে এসেছেন এই বিজন কাননের স্নিগ্ধতা ও বিভীষিকার মধ্যে। ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে চন্দ্রাতপ হতে পারে একমাত্র এই অনন্ত আকাশ।

রাজছত্র কখনো কোনো রাজাকে শান্তি দেয়নি। রাজমুকুট কাউকে স্বস্তি দেয় না। তাই বৃদ্ধরাজা দশরথ আক্ষেপ করে রামকে বলেছিলেন এতকাল আমি শুভ্ররাজছত্র তলে নিজেকে জীর্ণ করেছি মাত্র—

'পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্যচ্ছায়ায়াং জরিতংময়া।'

(অয়োধ্যাকাণ্ড— ২/৭)

পরবর্তী সময়ে বনবাসী রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে অনুজ ভরতকেও রাম প্রায় একই কথাই বলেছিলেন— 'ভরত, ফিরে যাও তুমি। অযোধ্যার রাজছত্র তোমার মাথায় ছায়া বিস্তার করুক। আর এই নিবিড় বনকানন আমার মাথার উপরে বিছিয়ে দেবে তার শীতল ছায়া।'

ছায়াংতে দিনকরভা প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধিঃশীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমানাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িস্যে।।

(অযোধ্যা কাণ্ড—১০৭/১৮)

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র পৌঁছে গেলেন তাঁর দিব্য আশ্রমে। অপ্রতিরোধ্য সব অস্ত্রে সুসজ্জিত করলেন রাম-লক্ষ্মণকে। এবার নিশ্চিন্ত মনে শুরু করলেন যজ্ঞ। রাম-লক্ষ্মণ উদ্যত শরাসনে বিনিদ্র হয়ে যজ্ঞ রক্ষা করছেন। হঠাৎ এক অশুভ ঘোর শব্দে আকাশ কম্পিত হতে লাগল। চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। যজ্ঞবেদীর পাশে আকাশ থেকে পড়ছে যত অশুচি রক্তধারা। শূন্যের অন্ধকারে যত বিকট রাক্ষসমূর্তি। তাদের চালনা করছে রক্তচক্ষু মারীচ আর সুবাহু।

কার্মুক টঙ্কার দিয়ে রাম বললেন— 'লক্ষ্মণ দেখ। ওই যে সব রাক্ষস এসেছে, দুর্বৃত্ত নরখাদক। ওরা স্বভাবে হীন। ওদের মেরে কী হবে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে বিতাড়িত করে, তেমনি মানবাস্ত্র দিয়ে আমি ওদের দূরে অপসারিত করছি।'

রামের ধনুকে জ্বলে উঠল ভীষণ মানবাস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে পরাভূত মারীচ হতচেতন হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো শতযোজন দূরে সমুদ্র গর্ভে। নিহত হলো সুবাহু। রামের দিব্যাস্ত্র নিমেষের মধ্যে অপসারিত করল শত শত রাক্ষসবাহিনী।

অন্ধকার সরে গেল।... যজ্ঞের বিঘ্ন দূর হলো।

বীরশ্রেষ্ঠ রাম। কিন্তু তাঁর হৃদয়খানি পদ্মকোষের মতো কোমল। মমতাময় হৃদয় তাঁর বীরত্বকে দিয়েছে এক মহত্ত্ব ও মর্যাদা। ক্ষমা আর দয়ার দুই অটল তটে বাঁধা রামের বীরত্ব। তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যতবার অস্ত্র তুলে ধরেন, ততবারই তাঁর প্রেমিক হৃদয় বলে, 'আমি এদের হত্যা করতে চাই না'— 'নোৎসহে হন্তমীদৃশান'।

(আদিকাণ্ড— ৩০/১৬)

রামের যুদ্ধ শিবিরে রাবণের গুপ্তচর শুক ও সারণ অনুপ্রবেশ করেছে বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে ধরে রামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এসেছেন, জানালেন এরা রাবণের গুপ্তচর, ছদ্মবেশে যুদ্ধশিবিরে প্রবেশ করে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবল ও সকল গুপ্তসংবাদ জেনে নিতে এসেছে।

বন্দি দুই রাক্ষস তখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে করজোড়ে কাঁপছে। শত্রুর গুপ্তচর, রাজধর্মের বিধি অনুযায়ী প্রাণদণ্ডই ওদের প্রাপ্য। কিন্তু রাম স্মিতহাস্যে প্রসন্নবদনে তাদের বললেন— ভয় নেই, ধরা পড়লেও আমি তোমাদের প্রাণে মারব না— 'ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভৈতব্যং জীবিতং প্রতি।' (যুদ্ধকাণ্ড— ২৫/২০)

এমনকী চরম শত্রু যে রাবণ, যখন সে যুদ্ধে আহত অবসন্ন হতোম্মুখ, যখন একটি মাত্র আঘাতেই তাকে বধ করা যায়। জয়লাভের এমন সুযোগ পেলেও রাম তা গ্রহণ করলেন না। রণক্লান্ত শত্রুকে রাম কখনো আঘাত করেন না। মুমূর্ষু রাবণকে নিয়ে তার সারথি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। (যুদ্ধকাণ্ড— ১০৩ সর্গ)

এমন দৃশ্য আমরা বারবার দেখি। রাম যখন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করেন, তখনও তার মনে কোনোও ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, নিষ্ঠুরতা নেই। শান্ত চিত্তে কল্যাণবুদ্ধি নিয়ে ক্ষাত্রধর্মে উদ্বোধিত অন্তরে তিনি তাঁর অস্ত্র হানেন। রামের এই মহত্ত্বকে

অকপটে স্বীকার করেছে তাঁর চিরশত্রু রাবণ। রাবণ মারীচকে বলছে— 'রাম যুদ্ধের সময় ক্রুদ্ধ হন না। একটিও কর্কশ বাক্য বলেন না।

'অনুক্তা পুরুষং কিঞ্চিচ্ছিবৈ ব্যাপারিতং ধনুঃ।'

(অরণ্যকাণ্ড—৬৩/৮)

রাম অনায়াসেই মারীচকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু তাকে প্রাণে মারলেন না। আহত করে দূরে নিক্ষেপ করলেন মাত্র। মারীচের জন্য তাঁর মনে হয়তো দয়া হয়েছিল। হতভাগ্য মারীচ। অগস্ত্যের অভিশাপে পিতা সুন্দকে হারিয়েছে। মাতা সুন্দরী যক্ষিণী। চোখের সামনে হয়ে গেল রাক্ষসী তাড়কা। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে নিজেও হলো রাক্ষস। রাক্ষসরাজ রাবণের আশ্রিত হলো। মারীচের জীবনের এই বিপর্যয় পতিতপাবন রামকে ব্যথিত করেছিল। তাছাড়া কদিন আগে তার মাতা তাড়কাকে তিনি বধ করেছেন। তাই মারীচকে বধ করতে তাঁর হাত উঠল না। মহাকবি কালিদাস বড়ো সুন্দর করে বলেছেন— 'রাম পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ।' —'পিতৃমান বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী।' (রঘুবংশ—১৪/২৩)

যথাযথ কর্তব্যে অবিচল রাম। রামের চতুর্দশ বছর বনবাসের সিদ্ধান্তে অনুজ লক্ষ্মণ প্রকৃতপক্ষে দশরথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছিলেন, প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল মাতা কৌশল্যার। কিন্তু রাম তা সমর্থন করেননি, তিনি লক্ষ্মণকে বলেছিলেন— 'লক্ষ্মণ শান্ত হও। এই উগ্র অনার্য বুদ্ধি ত্যাগ কর। আমি তোমার বিক্রম জানি। আমার প্রতি তোমার স্নেহ যে কত গভীর তাও জানি। কিন্তু ধর্মই সত্য। সত্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মে। আমি কখনো পিতা, মাতা ও ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করতে পারবো না। তুমি এই দুর্মতি ত্যাগ কর।'

বালীবধ রাম চরিত্রকে কতটা কালিমালিপ্ত করেছে এই একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। মুমূর্ষু বালী যখন তীব্র ভাষায় রামকে প্রশ্ন করে, বিখ্যাত সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করে, তেজস্বী,

বীর্যবান, ধর্মব্রতচারী, কালজ্ঞ হয়েও কেন রাম এই অন্যায় করলেন? বালীর যুদ্ধ হচ্ছিল সুগ্রীবের সঙ্গে, রামের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। তবুও কেন রাম বালীর অসতর্ক অবস্থায় তাকে বধ করলেন। বালী রামকে তিরস্কার করল— দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী, অধার্মিক বলে, ক্ষুদ্র, নীচ শঠ, প্রতারক বলে।

'হত্বা বানেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম।।
শঠো নৈষ্কৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশিতমানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাত পাপো মহাত্মনা।।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৩৫, ৪৩)

বালীর এহেন বাক্য শুনে রাম ধীর শান্ত কণ্ঠে বালীকে উত্তর দিলেন— তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও সদাচার সম্বন্ধে কিছুই জান না। তাই অজ্ঞান বালকের মতো আমার নিন্দা করছ। তোমাকে বধ করে আমার ক্রোধও হয়নি, মনস্তাপও হয়নি।

'ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সমরং চাপি লৌকিকম্।'
'ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপঙ্গব।'

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১৮/৪, ৩৭)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি করে বানর সেনার সাহায্যে লঙ্কা জয়ের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র সুগ্রীবের শত্রু বালীকে বধ করেছেন।

কিন্তু সীতা হরণের সংবাদ পেয়ে ভরত অযোধ্যা এবং আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে একত্রিত করে এক বিশাল সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন। রামের আগ্রহ থাকলে লঙ্কা জয়ের পক্ষে সেই সেনা যথেষ্ট ছিল। আসলে বালীবধ রামচন্দ্রের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য ছিল না। ভাবাবেগও নয়। এমনকী ন্যায়-অন্যায়েরও নয়। এখানে বালীকে উপলক্ষ্য করে সংঘাত বেঁধেছে ক্ষুদ্র ধর্মের সঙ্গে বৃহৎ ধর্মের। বালী স্বভাবধর্মে রাক্ষস প্রকৃতির ছিল না, কিন্তু সে রাক্ষস রাবণের পরম মিত্র। রাবণের আসুরিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সে এক আবিল প্রাণের কামার্ত, ভোগসর্বস্ব, ক্রূর, জিঘাংসা প্রমত্ত জীবনধারা। সেখানে শিল্প-ঐশ্বর্য যতই থাক, তা ছিল দানবের উন্মত্ত অহমিকার বহিঃপ্রকাশ, রাবণ যার প্রতীক। বালীর জীবন ও রাজত্ব ছিল এই ধারারই অনুবর্তী। কিন্তু রামের আদর্শ হলো এই আসুরিক স্বৈরতন্ত্র, তার পাশব প্রাণ, তার আত্মসার বিকট অহংকারকে ধ্বংস করে, সেখানে সত্য, ধর্ম ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামঞ্জস্যের এক সুশৃঙ্খল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাক্ষুসে প্রাণের বুভুক্ষার পরিবর্তে সাত্ত্বিক মনের ঔদার্য ও মহিমার প্রতিষ্ঠা করা, যাকে বলা হয়েছে— 'রামরাজ্য'।

শ্রীরামচন্দ্র এক আদর্শরাজা। প্রজাদের সন্তোষ বিধান, তাদের কল্যাণ সাধন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই কুলগুরু বশিষ্ঠের বার্তা পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন—

স্নেহংদয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তিমে ব্যথা।।

(উত্তররামচরিত—১/১২)

প্রজাদের সন্তোষ বিধানের জন্য স্নেহ, দয়া, সুখ, এমনকী আমার জীবনসর্বস্ব সীতাকেও আমি পরিত্যাগ করতে পারি।

এভাবে দেখা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ প্রেমিক এবং আদর্শ রাজা। কিন্তু দুর্মুখ যখনই সীতা চরিত্র বিষয়ে জনাপবাদের কথা রামকে জানিয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে রামের মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে পত্নীপ্রেম, অন্যদিকে রাজধর্ম। রামচন্দ্র সীতার চরিত্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ। তাই এই আঘাত তাঁর কাছে দুর্বিষহ। তিনি মূর্ছিত হয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সীতা পরিত্যাগের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্মণকে ডেকে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসতে বলেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এ রাজাদেশ। লক্ষ্মণ রাজাদেশ লঙ্ঘন করতে পারবেন না। কুলধর্ম ও রাজধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে শ্রীরাম পতিধর্মকে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্তর হয়েছে শতধা বিদীর্ণ। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে নিষ্ঠুর ঘাতকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রজাদের প্রতি তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই, আছে প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাই তিনি দুর্মুখের কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন—

শান্তং পাপং শান্তং পাপম্।
দুর্জনা নাম পৌরজনপদাঃ।

পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজারা কখনো দুর্জন হতে পারে না। তারা ইক্ষ্বাকুবংশকে ভালোবাসে। 'ঈক্ষ্বাকুবংশোহভিমতঃ প্রজানাম্।'

(উত্তররামচরিত—১/১২)

শম্বুককে বধ করার সময়ও শ্রীরামের চরিত্রে আমরা অনুরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। ধর্মীয় অনুশাসনে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নেই। শূদ্র শম্বুকের তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। রাজা হিসাবে রামকে এর প্রতিকার করতে হবে। অশরীরী বাক্ এই প্রতিকারের উপায় বলে দিয়েছে। রাজা রাম তাই শূদ্র তপস্বী শম্বুককে বধ করেছেন। কিন্তু মানব রামচন্দ্র এই বিধান মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন— 'দুর্বহ গর্ভভারে পীড়িত নিজের পত্নীকে যে নিপুণ ভাবে পরিত্যাগ করতে পারে, তার অঙ্গভূত দক্ষিণ হস্তের কোনো দয়া থাকতে পারে না।

অতএব, হে আমার দক্ষিণ হস্ত, তুমি তপস্যাচরণকারী শূদ্রের উপর কৃপাণের আঘাত কর।' (উত্তররামচরিত—২।১০)

তারপর দিব্যদেহধারী শম্বুককে অভিনন্দিত করে শ্রীরাম বললেন— 'তুমি আনন্দময় বৈরাজলোকে গমন কর—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ যত্র পুণ্যাশ্চ সম্পদঃ।
বৈরাজা নাম তে লোকাস্তৈজসাঃ সন্তু তৈশিরা।।

(উত্তররামচরিত—২-১২)

মানুষ রাম বুঝতে পারছেন তপস্যা মহত্তম কর্ম। এখানে সকলের অধিকার থাকা উচিত। তাই তাঁর শম্বুকবধে দ্বিধা এবং পরে দিব্য দেহধারী শম্বুকের প্রতি এই অভিনন্দন।

শ্রীরামচন্দ্র রাজকর্তব্য করে চলেছেন। প্রিয়তমা সীতাকে তিনি পরিত্যাগ করলেন, শূদ্র-তপস্বীকে তিনি বধ করলেন। বাইরে কোনো বিকার নেই, কঠোর এই লোকতন্ত্রাধিকার। কিন্তু মানুষ রামচন্দ্র অন্তরে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছেন, যার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। ভবভূতি রামায়ণাশ্রিত উত্তর রামচরিত নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব উত্তমভাবে পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর কল্পিত বাসন্তী চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে রামচরিত্রের মূল রহস্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরানাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।।

(উত্তররামচরিত—২-৭)

সত্যই শ্রীরামের চরিত্র কখনো বজ্র অপেক্ষা কঠিন, আবার কখনো কুসুম অপেক্ষাও কোমল। কর্তব্যের উপাসনায় তিনি একান্ত দীক্ষিত। কর্তব্য তাঁকে করেছে বজ্রের মতো কঠোর কিন্তু মানবিক অনুভূতি তাঁকে করেছে কুসুমের মতো কোমল।

পুলিশ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পর এখন সেই ছাত্র নেতাদের নিশানায় সেনাবাহিনী

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঢাকা টালমাটাল, প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তা। অনেক উত্তেজনা ও নাটকীয়তার মধ্যে ২৪ মার্চ যখন এই প্রতিবেদন লিখছি, তখন স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গনি সাংবাদিকদের জানাচ্ছেন, দেশে জরুরি অবস্থা জারি নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটা ‘গসিপ’ (খোশগল্প) ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ গতকাল সেনা সদর দপ্তরে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ‘সেনা শাসন আসছে, জারি হচ্ছে জরুরি অবস্থা’ কিংবা ‘ড. ইউনুস পদত্যাগ করছেন’ এ ধরনের নানা কথা ছড়িয়ে পড়লে তড়িঘড়ি সংবাদ সম্মেলন ডেকে ‘গসিপ’ তত্ত্ব জানানো হলো।

অবশ্য সেনাপ্রধানও একই দিন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে স্পষ্ট করে বলেছেন, গুজব ও ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

নির্ভরযোগ্য তথ্য বলছে, সেনাপ্রধান অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছেন, শক্তিশালী নবম ডিভিশন-সহ সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সব বিভাগ ও পদাতিক ডিভিশনগুলো তাঁকে সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছে।

যে ছাত্ররা একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত বাইডেন প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা ও জামায়াতে ইসলাম-হেফাজতে ইসলাম-হিজবুত তাহরির-বিএনপির সহায়তায়, এখন নতুন দল গড়ে (ড. ইউনুসের সরাসরি প্রণোদনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি গঠিত, কিংস পার্টি হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। এর মধ্যে খবর বেরিয়েছে এই দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে ইউনুস রাষ্ট্রপতি হতে চান) সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তারাই তৈরি করেছে, ইউনুসকে তারাই ক্ষমতায় বসিয়েছে হাসিনার পতনের পর, এই সরকার কার্যত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। তথাকথিত গণঅভ্যুত্থান বা জেহাদি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছাত্ররা পুলিশ বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে, এই পুলিশ এখনো শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ড. ইউনুসকে ক্ষমতায় বসানোর পর ছাত্ররা দ্বিতীয় কাজটি করে বিচার বিভাগে সহিংস উপায়ে, এখন এই বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ তাদের আজ্ঞাবহ। শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের সপ্তাহখানেকের মধ্যে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ থেকে অভিজ্ঞ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক বিচারকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ছাত্রদের ঘেরাওয়ের মুখে। নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম, বিএনপি ও হিজবুত তাহরিরের পছন্দের লোকজন। প্রশাসন থেকেও সরানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো শিকার হয়েছেন হিন্দুরা। শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশের শীর্ষ পদে এখন হিন্দুরা নেই।

এবার জেহাদি ছাত্রদের নিশানা সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীকে দুর্বল, বিধ্বস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারলেই কেল্লাফতে; ইসলামি খেলাফতি শাসন কায়েমের পথে আরও একধাপ এগুনো যাবে। খবর রটেছে, সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানি ধারা ইতিমধ্যে চোখে পড়ার মতো শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই অংশ থেকেই ছাত্ররা মদত পাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। দুই ছাত্র নেতা, এখন জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা ও মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সারজিস আলম সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে

চেয়েছিলেন, দেখা হয়েছে। তারপর হাসনাত আবদুল্লাহ সেনাপ্রধানকে জড়িয়ে যে গল্প ফেঁদেছেন তা অত্যন্ত ভয়ংকর। সেনাপ্রধান নাকি রিফাইন্ড আওয়ামি লিগ মেনে নিতে বলেছেন। আরও নাকি বলেছেন, একাধিক রাজনৈতিক দলকেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

হাসনাত গত ১১ মার্চ এই বৈঠকের কথা উল্লেখ করে ফেসবুকে জানান, এই নতুন ষড়যন্ত্র ভারতের; সেনাপ্রধান এটায় সহযোগী হয়েছেন। সেনা সদর থেকে এর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত হাস্যকর ও অপরিপক্ক গল্প'। অবশ্য এ নিয়ে নতুন দলের মধ্যেই ফাটল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এখানে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর ওয়াকারের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তিনি ক্ষমতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আরও রক্তক্ষয় হতে পারতো, তিনি সংযম দেখিয়েছেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা নিরাপদে গত ৫ আগস্ট ঢাকা ত্যাগ করেছেন, সেনাবাহিনীর সহায়তা না থাকলে ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারতো। সেনাপ্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক বৈঠকে মিলিত হয়ে দ্রুত শূন্যতা পূরণের পদক্ষেপ নেন। গত ৮ আগস্ট ড. ইউনুস ফ্রান্স থেকে ফিরে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জানা যায়, ওয়াকার উজ জামান গোড়াতেই ড. ইউনুসের ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা ছিল, রায়ও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের দাবির মুখে আপত্তি টেকেনি, ক্ষেপণাস্ত্রের চাইতেও দ্রুত গতিতে মামলা তুলে নেওয়া হয়, যেগুলোর রায় হয়েছিল তা বাতিল করা হয়। বিচারকরাই এই ক্ষেপণাস্ত্রের চালকের আসনে ছিলেন।

পুলিশের অপারগতা ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সেনাবাহিনী এগিয়ে আসায় কিছুটা রক্ষা পায়। সেনাবাহিনী সবচেয়ে বড়ো কাজটি করে ব্যাপকভাবে হামলার শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়ে। প্রশাসন ও পুলিশ যখন সাম্প্রদায়িক হামলা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিল ওয়াকারের নির্দেশে সেনা সদস্যরা ছুটে যান, দুর্বৃত্তদের যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে কিছু স্বস্তি ফিরে আসে। এ ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নেয় নবম ডিভিশন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মেজর জেনারেল মইন।

প্রশাসন ও বিচার বিভাগ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এই সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি, বিশেষ করে ওয়াকার উজ জামানকে সরাতে ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলের পেছনের শক্তি এখন মরিয়া। শীর্ষ নেতারাই বলছেন সেনানিবাস দখল করতে হবে, প্রয়োজনে সশস্ত্র লড়াই হবে। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র মজুতের কথাও বলছেন তাদেরই কেউ কেউ। এই অস্ত্র আসবে কোত্থেকে? তবে কি পাকিস্তান থেকে? এমন খবরও বেরিয়েছে, গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর পাকিস্তান থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটি জাহাজ এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করে। কোনো কোনো গণমাধ্যমের আশঙ্কা এই জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এসেছে। পাকিস্তান থেকে ছুটে এসেছেন সামরিক গোয়েন্দা প্রধান, যার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে সেনাবাহিনীর অন্তত দু'জন কর্মকর্তার, যার একজন লে. জেনারেল ফায়জুর রহমান। বৈঠক হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন শীর্ষ নেতার সঙ্গেও। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের ছাত্র সদস্য আসিফ মাহমুদ সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে তারা মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য চাইতে।

হিজবুত তাহরির আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন, বাংলাদেশেও শেখ হাসিনা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেই সংগঠন এখন প্রকাশ্যে এসেছে। অন্তত এক মাস আগে রঙিন পোস্টারে তারা গত ৭ মার্চ খেলাফত শাসনের দাবিতে মিছিল করার ঘোষণা দিয়েছিল। ড. ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাহফুজ আলম হিযবুত তাহরিরের নেতা বলে গণমাধ্যমে খবর হয়েছে। ড. ইউনুস কয়েক মাস আগে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন এই মাহফুজ আলম। ইউনুস জাতিসঙ্ঘ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাহফুজকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হিজবুত তাহরির পূর্ব ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামে, অবশ্য তাদের মিছিল করে বেশি দূর যেতে দেয়নি সেনাসদস্যরা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় মাস খানেক আগে পোস্টার ছাপিয়ে মিছিলের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থা আগেভাগে নেওয়া হয়নি কেন? তবে কি তারা সরকারের অংশ?

শেখ হাসিনা বহু জঙ্গিকে কারাগারে পুরেছিলেন, জেহাদি ছাত্ররা আগস্টের শুরুতে বিভিন্ন কারাগারে হামলা চালিয়ে তাদের মুক্ত করে দিয়েছিল। অভিযোগ আছে, এই জঙ্গিরা মুক্ত হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেয়। একটা বিষয় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করছেন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা, শেখ হাসিনা পদত্যাগের আগে পুলিশের গুলিতে প্রচুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। কিন্তু সব গুলি কি পুলিশ চালিয়েছিল? দেখা গেছে, মৃতদের অনেকের শরীরে এমন বুলেট পাওয়া গেছে যা পুলিশ ব্যবহার করে না। তবে এই গুলি ছুঁড়েছে কারা? ছাত্ররা এখন নিজেরাই বলছে, তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। লক্ষণীয় যে, ছাত্র আন্দোলনের নেতা, এখন নতুন দলের শীর্ণ নেতা সারজিস আলম হাসিনার পতনের পর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, যারা মারা গেছে তাদের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে দেওয়া হবে না। এখানেই প্রকৃত রহস্য লুকিয়ে আছে বলে অনেকের ধারণা। □

'মৃত্যুকুম্ভ'র বক্তরা কি ইসলামিক লক্ষ্যপূরণের পথ প্রশস্ত করলেন না?

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

প্রয়াগে তীর্থ স্নানের কথা পাওয়া যায় ঋকবেদে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রয়াগ স্নানের কথা স্বয়ং বুদ্ধদেব বলেছেন। মহাভারতে 'অতীতের ভুল ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য' প্রয়াগ স্নানের বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। কুম্ভমেলার বয়স নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকলেও খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় বৃহৎ সমাবেশের মধ্য দিয়ে কুম্ভমেলার উল্লেখ পাওয়া যায়; সময়কাল ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ। মেগাস্থিনিসের লেখাতেও হিন্দু সমাবেশ ও তীর্থ স্নানের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কুম্ভমেলাকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত রূপদান করেন হিন্দু ধর্মের অন্যতম সংস্কারক আদি শঙ্কারাচার্য। তিনি ভারত জুড়ে বিভিন্ন মঠ ব্যবস্থার জাগরণ, ধর্মীয় সমাবেশ ও দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রস্থল করেছিলেন কুম্ভমেলাকে। মহানির্বাণী, অটল, নিরঞ্জনী, আনন্দ, জুনা, আবাহন ও অগ্নির মতো সাতটি শৈব আখড়া এবং নির্বাণী, দিগম্বর ও নির্মোহী'র মতো তিনটি বৈষ্ণব আখড়া সমন্বয় ঘটেছিল তাঁরই হাত ধরে এই কুম্ভমেলাতে। নাগা সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করার প্রথম প্রয়াস তাঁর হাত ধরে কুম্ভমেলাতে। ১৬শো শতাব্দীতে তুলসীদাসের রামচরিত মানসে প্রয়াগে বার্ষিক মেলার যেমন উজ্জ্বল উল্লেখ দেখা যায়, তেমনি 'আইন-ই-আকবরী'তে কুম্ভকে হিন্দুদের 'তীর্থস্থানের রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা 'তাবাকাত-ই-আকবরী'তে প্রয়াগ সঙ্গমের স্নানের দৃশ্যের বর্ণনা আছে।

কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসা ভারতের এই পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে বিধর্মীরা। মুছে দিতে চেয়েছে তার আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত উজ্জ্বল দিকগুলো। ১৩৯৯ সালে তৈমুরের সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। তাঁর জীবনীকার শরফ আদ-দিন আলি ইয়াজদির মতে, তৈমুরের সেনাবাহিনী হরিদ্বার লুণ্ঠন করে এবং সমবেত তীর্থযাত্রীদের হত্যা করে। ১৮৮৫ সালে খ্রিস্টানদের সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রয়াগ কুম্ভমেলার ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয় হোসেন নামের এক মুসলমানকে। মদ ও গোমাংস সহযোগে ইউরোপীয় ভদ্রলোকেদের নৌকা বিহারে আধ্যাত্মিক হিন্দুদের স্নান দৃশ্য নিয়ে বিকৃত উল্লাসের বর্ণনা লিপিবদ্ধও করে। ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহের সময় ইতিহাসে কুম্ভমেলার স্থানকে ধ্বংস করে দেওয়া উল্লেখ আছে। সেই কুম্ভেই ইংরেজ প্রশাসক নিলের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রীদের ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টার সাক্ষীও থেকেছে এই দেশ।

কুম্ভমেলা ভারতআত্মা ও ভারত সংস্কৃতির এক পূর্ণরূপ। আদি শঙ্করাচার্য চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ভাব আর ভাবনার মিলন স্থল, হিন্দুদের ঐক্য ও সমন্বয়ের পুণ্যভূমি হয়ে উঠুক এই কুম্ভমেলা। অনন্তকাল ধরে যে মুনি-ঋষি, বিভিন্ন আখড়ার সাধুসন্ত, নাগা সাধু, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রাণকে বুকে করে যাপন করেছেন এবং তাঁরাই প্রয়োজনে অস্ত্র ধরেছেন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে। মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দু বিপন্নতার কালে ১৭৬৬ সালে হরিদ্বারে, ১৭৪৫ সালে প্রয়াগে মুসলমানদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন হাজার হাজার সন্ন্যাসী। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে প্রয়াগ কুম্ভমেলাতে 'সনাতন ধর্মসভা' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। বারবার হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধতার উজ্জ্বল উদাহরণ এবং হিন্দু আন্দোলনের তীর্থস্থান হয়ে থেকেছে কুম্ভমেলা। ১৯৬৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠাও হরিদ্বার কুম্ভমেলায়।

এই যে কোটি কোটি মানুষের সমাবেশ, তীব্র শীত উপেক্ষা করে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে, মাইল মাইল পথ হেঁটে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে খোলা আকাশের নীচে রাত জাগার কুম্ভমেলা, হয়তো জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। হয়তো-বা প্রতিদিনের জীবন সংগ্রাম আর সংসার যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে একটুকু 'অমৃত'র সন্ধান।

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ থেকেই মহাকুম্ভমেলাকে 'মৃত্যুকুম্ভ'র বিতর্ক বড়ো ব্যথিত করে হৃদয়কে। সবকিছুকে রাজনীতিকরনের এই হীনম্মন্যতা, ইতিহাস বিমুখ বাঙ্গালিকে আরও একবার লজ্জিত করে, কুণ্ঠিত করে সারা বিশ্বের কাছে। পাল ও সেন যুগে মুসলমান আক্রমণের কারণে হুগলী জেলার ত্রিবেণী সঙ্গমের কুম্ভমেলা ১৩১৯ সালের পর প্রায় ৭০০ বছর বন্ধ থেকেছে। বেহুলা-লখিন্দর খ্যাত হুগলি জেলার ত্রিবেণী যেখানে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন হয়েছে সেখানেই একদিন বিখ্যাত সাধুসন্তরা পুণ্য স্নানে এসেছিলেন। গঙ্গাসাগর যেমন কপিল মুনির তপস্যাস্থল, তেমনি এই ত্রিবেণীর সপ্তর্ষি ঘাটে তপস্যা করে গেছেন পুলহ, পুলস্থ, অত্রি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো ঋষিরা। তপস্যা করেছেন বাবা লোকনাথের গুরুভাই বেণীমাধবের মতো বিশিষ্ট মনীষী। বারে বারে এই স্থান ধ্বংস করেছে বখতিয়ার খলজি। আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি জাফর খাঁ গাজি ত্রিবেণী ঘাটের বিষ্ণু ও সরস্বতী মন্দির ধ্বংস করে তাকে 'গাজির দরগা'য় পরিণত করেছে। বন্ধ করে দিয়েছিল এই ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্য স্নান। পুনরায় যা চালু করতে ৭০০ বছর লেগে গেল বাঙ্গালির। তাই আজকের 'মৃত্যুকুম্ভ' প্রবক্তাদের শিরায় জাফর খাঁ গাজিদের রক্ত বইছে কিনা খোঁজ নেওয়াটা জরুরি। সারা পৃথিবীর ইতিহাস দেখিয়েছে, মুসলমান শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইসলামি আগ্রাসন। ধ্বংস করেছে স্থানীয় চিরাচরিত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা। কায়েম হয়েছে অপ্রতিরোধ্য ইসলামিক আধিপত্য। ভারত এখনও সারা বিশ্বের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ যে ইসলামের এই আগ্রাসনকে পুরোপুরি কার্যকর হতে দেয়নি। 'মৃত্যুকুম্ভ'র বক্তারা সেই ইসলামিক লক্ষ্য পূরণের ঘুঁটির চাল কিনা সে প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে প্রতিদিন।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

জাতীয় বিদ্যালয়

কেশবের এক কথা— 'বিদেশি সরকারের শাসনে মাতৃভূমির বন্দনা যদি অপরাধ বলে গণ্য হয় তবে সে অপরাধ অসংখ্যবার করব'। দুরন্ত বেগবান যুদ্ধের অশ্ব কি সামান্য ঝঞ্ঝাতে ভয় পায়! 'বন্দেমাতরম্' কাণ্ডে সমস্ত ছাত্ররা পরোক্ষে ভুল স্বীকার করে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেও কেশব যায়নি। ভবিষ্যৎ জীবন সেই মুহূর্তে ছিল এক অনিশ্চয়তার পথে দাঁড়িয়ে। ডাঃ মুঞ্জে ছিলেন স্বদেশব্রতী লড়াকু মানসিকতার। কেশবকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর বাড়িতেই থাকা শুরু করলো কেশব, তাতে গোয়েন্দার নজর থেকে অনেকটা বাঁচা গেল। খাওয়া-দাওয়া ওখানে হলেও কখনো কখনো ছোলামুড়ি খেয়েই তাকে দিন কাটাতে হতো। মাঝে মাঝে কিছু না খেয়ে খালি পেটেই শুয়ে পড়তে হতো তাকে। এই কষ্টকর জীবনের কথা কেউ কোনোদিন তার কাছ থেকে শোনেনি। পরবর্তীকালে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পকথায় স্মৃতিকথার টুকরো টুকরো যা কিছু জানা গেছে।

কাকা আবাজী কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের এমন দেশভক্তি দেখে আপ্লুত। ওর পড়াশোনা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাও করেছিলেন। সেবার যবতমলের মাধব হরি আণে, (যিনি পরে ১৯৩১ সাল থেকে 'লোকনায়ক' নামে অভিহিত হয়েছিলেন) ও নারায়ণরাও বৈদ্য রামপায়লীতে বক্তৃতা দিতে এলে আবাজী অবসর মতো কেশবরাওয়ের কথা বলেন, আণেকে অনুরোধ করেন কেশবকে যবতমলের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে কিনা। মাধবরাও সানন্দে স্বীকৃতি দেন কারণ এই জাতীয় বিদ্যালয় তো এমন দেশভক্ত ছাত্রদের জন্যই— যারা ইংরেজের কোপদৃষ্টিতে পড়ে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। যবতমলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই ডাঃ বাবাসাহেব বা নরহর শিবরাম পরাঞ্জপের প্রচেষ্টায় এই জাতীয় বিদ্যালয় শুরু হয়। যার নাম 'বিদ্যাগৃহ'। ১৯০৯ সালে কেশবরাও এখানে ভর্তি হলো। এখানে বেশিরভাগ সময়ই কেশব বাপুজী আণের গৃহে ভোজন করতো, পড়াশোনার জন্য যেত দত্তোপন্ত আচার্যের বাড়ি। সামান্য জীবিকা নির্বাহের মতো অর্থ নিয়ে একদল দেশভক্ত শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে পাঠদান করতেন।

অর্থ লাভের জন্য নয়, দেশের কাজের জন্যই তারা এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। লোকমান্য তিলক সমাজে তাদের শিক্ষকের জন্য বহুবার আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু তাঁরই কথা, তেমন মানসিকতার লোক ছিল দুর্লভ। কেশবকে এখানেও অনেকদিন না খেয়ে স্কুলে আসতে হতো কিন্তু তা কেউ জানতে পারতো না, শিক্ষক দত্তোপন্তের চোখে বিষয়টি ধরা পড়লে স্কুলেরই একজন ছাত্র গণেশ সুলের উপর কেশবের খাওয়াদাওয়া বিষয়টি দেখাশোনার ভার দেন তিনি। বিদ্যালয়ের দিন চলতো সাধারণের দাক্ষিণ্যে, পরিবারে পরিবারে মুষ্টি চাল সংগৃহীত হতো। তারপরে তা পৌঁছে যেত বিদ্যাগৃহে।

যত ভালোই হোক, ইংরেজ সরকার এই জাতীয় বিদ্যালয় ভালো চোখে দেখতো না, নানা ফন্দিফিকির শুরু হলো এগুলো বন্ধ করার জন্য। গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত অফিসার ক্লিভল্যান্ডকে পাঠানো হয়েছিল এই কাজে। শেষ পর্যন্ত নানা কায়দায় 'বিদ্যাগৃহ' বন্ধে তিনি সফল হলেন। এর আগে অমরাবতী জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কেশব ও তার বন্ধুরা দমলো না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, ঠিক হলো জুলাই মাসে তারা কলকাতা রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠের অন্তর্গত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেবে। কেশবের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল অমরাবতী। কেশব ও তার দুই বন্ধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলো।

১৯০৯ সালের ১ ডিসেম্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণ পত্র কেশবের কাছে পৌঁছে গেল। 'দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (বেঙ্গল)-এর সভাপতি হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ।

(সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস)